

চেতনার অন্বেষণে

মে সংখ্যা, ২০২২

ঈশ্বরকণা ঈশ্বরের জিয়নকাঠি না মৃত্যুবাণ

Hate Politics বলে কিছু হয়না, নিরপেক্ষ বলে কিছু হয়না

রাজা রামমোহন রায়ের কবিতা এবং এক মহান যোগসূত্র

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের মাসিক পত্রিকা **'চেতনার অন্বেষণে'** মে সংখ্যা, ২০২২।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- **যুক্তিবাদীরা।**

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:



নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় এলে তথ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন জোসেফ গোয়েবলস। মিনিস্ট্রি-অব-প্রপাগান্ডার মুখ্য দায়িত্বও সামলেছেন। এই মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল 'মিথ্যা' প্রচার করা। বিখ্যাত উক্তি - 'একটি মিথ্যা বারবার বলতে থাকলে মানুষ একসময় তা বিশ্বাস করতে শুরু করবে, এমনকি এক সময় আপনিও তা বিশ্বাস করে বসবেন'। অবশ্য এটি গোয়েবলসই বলেছেন কিনা জানা না গেলেও, দেশ-কাল পেরিয়ে উক্তিটি যে কতখানি খাঁটি তা সবাই মানেন। গোয়েবলসের মিথ্যাচার বাহিনী সংবাদমাধ্যম, রেডিও, বই, গান, থিয়েটার সব কিছুর একছত্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদের আইডিওলজি বা বিষ ছড়িয়ে দিতে থাকে আমজনতার মধ্যে। সত্য-মিথ্যা যাই হোক চিন্তন, আইডিওলজি ডিসকোর্স ছড়িয়ে পড়লে তার ক্ষমতা অপরিসীম। তারই একটি পরিনতিতে তীব্র ইহুদি বিদ্বেষ তৈরিতে গোয়েবলসরা সফল হয়, হলোকাস্ট তারই প্রমাণ। এই বিচিত্র ধুরন্ধর ব্যাক্তিটিকে নিয়ে বললে একটি আলাদা লেখা হয়ে যায়।

মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী সত্যপাল সিং মনে করেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভুল যেহেতু কেউ এপ থেকে মানুষ হতে দেখেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, গনেশের মুন্ডু পরিবর্তন প্রাচীন ভারতের প্লাস্টিক সার্জারিসহ চিকিৎসা শাস্ত্রে কী বিশাল পরিমান উন্নত ছিল তা বোঝা যায়। আর এক বিজেপি মন্ত্রী বলেন, গোবরে রেডিয়েশন আটকায়। বৈদিক যুগে এরোপ্লেন ছিল। নিউক্লিয়ার অস্ত্র ছিল মহাভারতের যুগে। ঘি পোড়ালে অক্সিজেন হয়, তা থেকে বৃষ্টি নামে। গরুর মুত্রে ক্যান্সার ভালো করার ক্ষমতা। সায়েন্স ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেছিলেন 'বৈদিক থিয়োরি' আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির থেকে বড়। এমন হাজারও মিথ্যাচার হয়ে চলেছে তা পাঠকেরা আরও যোগ করতে পারবেন। এইসব হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়ার আগে প্রতিটা আপাত বালখিল্য কথাতেই দেখবেন একটাই ছাঁচ হল প্রাচীন ভারতে সব ছিল। আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে আসেনি এরা এখানেই যুগ যুগ ধরে এখানেই আছে কিন্তু মুসলিমরা বাইরে থেকে এসেছে। প্রাচীন সম্পদ নষ্ট করেছে আর হিন্দুদের অত্যাচার করেছে। ধর্মান্তিরত করেছে। মন্দির ভেঙেছে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক একইরকম গোয়েবলসরাও নিজ জাতির উদ্ভব ও বিস্তারের ব্যাপারে প্রপাগান্ডা করেছিল।

সবচেয়ে ভয়ের এবং আশ্চর্যের কথা হচ্ছে খড়গপুর আইআইটি প্রযুক্তি বিজ্ঞানের পীঠস্থান সেখানেও এবছরের ক্যালেন্ডারে এভাবেই মিথ্যাচার করেছে। ইতিহাস বিকৃত করে আসছে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস। ব্রহ্মা প্রথম ডাইনোসোর আবিস্কার করেন এর নাম ছিল 'রাজাসোরাস', একথা যে সে আতি-পাতি লোকে বলেনি বলেছে সায়েন্স কংগ্রেস সম্মেলনে এক 'বিজ্ঞানী'। প্রচারণা করছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ পর্যন্ত। হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের হেড সুদর্শন রাও বলেছিলেন প্রাচীন ভারতে স্টেম সেল গবেষণার কথা, বলেছেন মহাভারতের নিউক্লিয় অস্ত্রের কথা।

এত বড় বড় পদে থাকা লোকজনের এসব উক্তি দেখলে অবাক যেমন হতে হয় তেমন মনে সন্দেহ দানা বাঁধে এজন্য যে বেশিরভাগই হিন্দুত্ব আইডিওলজিকে ধারণ করে। হিন্দুত্ব আইডিওলজি ছড়াচ্ছে একমাত্র মূল সংগঠন আরএসএস। সুদীর্ঘকাল জুড়ে ধীরে ধীরে গোটা ভারতে রুট লেভেলে এই সংগঠন ছড়িয়ে রয়েছে। এটি সেই সংগঠন যার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা নাৎসি চিন্তাকে আদর্শ মনে করে। এম.এস গোলওয়ালকার সংঘের চিফ থাকাকালীন সংঘকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেন, ইনি হিন্দু 'পিওরিটি' তৈরির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং জার্মানির নাৎসি ভারধারার প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আরএসএস-এর ভাবধারা আশ্রয় করে আজ কেন্দ্রে বিজেপি। তাই সংঘের ক্ষমতার আন্দাজ কম মানুষই করতে পারেন। সাধারণ মানুষ এই প্রাচীন বৈদিক প্রপাগান্ডা রাজনীতির শিকার হয়ে চলেছে। তারা কোথাও মন্দির খুঁজছে, কোথাও শিবলিঙ্গ। বেকারত্ব, দারিদ্রতা, মূল্যবৃদ্ধি এসব হিন্দুদের সমস্যা নয়। হিন্দুদের লক্ষ্য হল হিন্দুত্বের বিশুদ্ধিকরণ, তবেই দেশ বাঁচবে আর বৈদিক হিতগৌরব ফিরে পাবে হিন্দুত্ব।

মোবাইল ভার্সনটি ডাউনলোড করুন – click here

For pc to click: hold ctrl than click mouse left key

ঈশ্বরকণা ঈশ্বরের জিয়নকাঠি না মৃত্যুবাণ

-সাধন কুমার ঘোষ

১ম পর্ব

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মিওন লিওন লেডারম্যান (M.I.Lederman) সম্প্রতি (03.10.18) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন তাঁর (বিজ্ঞান লেখক ডিক টেরেসির সঙ্গে যৌথভাবে) লেখা সাড়া জাগানো বই 'ঈশ্বর কণা' (ইংরেজীতে The God Particle: If the Universe is the answer, what is the question? 1993)। লেডারম্যান নোবেল পেয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে, সাব অ্যাটমিক পার্টিকল নিউট্রিনো আবিস্কারের জন্য, এ তথ্য হয়ত খুব কম লোকই জানেন, কিন্তু তাঁর লেখা 'ঈশ্বর কণা' বইটির নাম শোনেননি এমন মানুষ কমই আছেন। বইটির অসম্ভব জনপ্রিয়তার জন্য এর নামের সঙ্গে 'God' শব্দটি অনেকাংশেই কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। এ নামটির মধ্যে দিয়েই যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান বইটিতে পাওয়া গেছে, তাই এত শোরগোল। স্বীকার করতেই হবে God শব্দটি জুড়ে দিয়ে প্রকাশক যথেষ্ট ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। আর স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর লেখা বই-এর নামে God বা ঈশ্বর জুড়ে যাওয়া ঈশ্বর বিশ্বাসীদের কাছে আত্মশ্লাঘার বিষয় বইকি। আসলে বিজ্ঞানচর্চা মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে যতটা প্রসারিত করেছে বিশ্বব্রহ্মান্ডের রহস্য তত তার কাছে উন্মোচিত হয়েছে, আর এর ফলে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের স্থান ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়েই চলেছে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসীরাও হাল ছাড়েননি, বিজ্ঞান যেমন ঈশ্বরের জগতে থাবা বসিয়ে চলেছে, ঈশ্বর বিশ্বাসীরাও যেন খোদ বিজ্ঞানকেই (আসলে বিজ্ঞানের ছোঁয়া) ততবেশী আঁকড়ে ধরতে চাইছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানে, কারন বিজ্ঞানের একটু ছোঁয়া থাকলে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, এটাই তাঁদের ধারনা, যতই তাঁরা বিজ্ঞানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকুন না কেন।

'ঈশ্বরকণা' কি তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সুক্ষতম রূপ? এটাই কি ছিল বইটির প্রামাণ্য বিষয়? এ আলোচনায় যাওয়ার আগে সাধারন ভাবে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়টা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিদ্যালয় স্তরের ছাত্ররা জানে সমস্ত পদার্থ অতি ক্ষুদ্র অনু দিয়ে গঠিত, আবার সমস্ত অনু মৌল কণা পরমানু' (প্রায় ১০০টি) দ্বারা গঠিত। কিন্ত পরমানুগুলিও গঠিত হয় আরও সুক্ষ কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দ্বারা। আর পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় এসমস্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় সেটা হল পার্টিকল ফিসিক্স। এখানে আলোচিত প্রাথমিক কণাগুলি (Elementary বা fundamental particle) হচ্ছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকল যাদের কোনো সাব স্ট্রাকচার এখনও পর্যন্ত জানা নেই। দেখা যাচ্ছে এরূপ প্রাথমিক কণার সংখ্যাও প্রায় একশত। আলোচ্য 'ঈশ্বর কণা' আসলে এরকম একটি এলিমেন্টারি সাব অ্যাটমিক পার্টিকল, যার কিছু বৈশিষ্টের জন্য একে দিয়েছে অনন্যতা। যাইহোক পদার্থ বিজ্ঞানে এইসব প্রাথমিক কণাই হল পদার্থ আর শক্তির (যারা একে অপরটিতে পরিবর্তিত হতে পারে) ক্ষুদ্রতম একক। পার্টিকল ফিসিক্সের স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে সব প্রাথমিক (elementary) কণাগুলিকে প্রধান দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,

১) ফান্ডামেন্টাল ফার্মিয়ন, এদের স্পিন হল অর্ধপূর্ণ সংখ্যা

২) ফান্ডামেন্টাল বোসন, এদের স্পিন হল পূর্ণ সংখ্যা।

এখনও পর্যন্ত জানা তথ্য অনুসারে ফার্মিয়নগুলি (আপ ডাউন চার্ম ইত্যাদী কোয়ার্ক, অ্যান্টি কোয়ার্ক, লেপ্টন, অ্যান্টি লেপ্টন গুলি) পদার্থের বিল্ডিং ব্লক, আর বোসনকণা গুলিকে (গেজ বোসন, হিগস বোসন গ্রাভিটন ইত্যাদী) বলা যায় বল বাহী কণা বা ফোর্স পার্টিকল। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও আলবার্ট আইনস্টাইন মিলে গত শতকের বিশের দশকে যে কোয়ান্টাম সাংখ্যায়ন (বোস-আইনস্টাইন সাংখ্যায়ন) প্রবর্তন করেছিলেন সেটা মেনে চলা মৌল কণা গুলিকেই বোসন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য ঈশ্বর কণা আদতে হল একটি বোসন কণা; বৈজ্ঞানিক মহলে এর স্বীকৃত নাম 'হিগস-বোসন'; কোন 'ঈশ্বর কণা' নয়। আবার একাধিক এলিমেন্টারী পার্টিকল দিয়ে তৈরী হতে পারে কম্পোজিট পার্টিকল। কোয়ান্টাম তত্বানুসারে এলিমেন্টারী পার্টিকল আপ ও ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে কম্পোজিট পার্টিকল গঠিত হয় যেমন প্রোটন, নিউট্রন গঠিত। এখন ফোর্স পার্টিকলগুলি যেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বাহক অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে চারটি ফান্ডামেন্টাল বলের (weak force, electromagnetic force, strong force, gravitation) কথা বলা হয়েছে তাদের বাহক, যেমন ফোটন হল তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের বাহক, আমাদের আলোচ্য হিগস বোসন কণা হিগস ক্ষেত্রের বাহক, তেমনি অভিকর্ষ ক্ষেত্রের বাহক ভাবা হয় গ্রাভিটন কণাকে যদিও আমরা এর প্রমাণ পাইনি, যেটা সম্প্রতি পাওয়া গেছে হিগস-বোসন এর ক্ষেত্রে। এই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু বিষয় বুঝে নিতে হবে।

হিগস ক্ষেত্র ও হিগস মেকানিজম : বিজ্ঞানী পিটার হিগস প্রস্তাবিত একটি শক্তি ক্ষেত্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বত্র বিরাজ করছে আর এই ক্ষেত্রের সঙ্গে বিভিন্ন মৌল কণার মিথস্ক্রিয়ার (interaction) ফলেই কণা গুলি ভর অর্জন করে। এই ক্ষেত্রের নাম হিগস ক্ষেত্র ও হিগস বোসন হল এই ক্ষেত্রের বাহক কণা (quanta)। যে প্রক্রিয়ায় হিগস ক্ষেত্রের সঙ্গে মৌলকণারা মিথস্ক্রিয়া করে সেটাই হল হিগস মেকানিজম। গত শতকের ষাটের দশকে ভরহীন মৌল কণাদের ভর প্রদান করে এমন একটি কণা বা ক্ষেত্রের তাত্বিক সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছিলেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী পিটার হিগস, ইংল্যান্ডের ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলাট সহ কয়েকজন বিজ্ঞানী ও ১৯৬৪ সালে এ সংক্রান্ত একটি গবেষনা পত্র প্রকাশিত হয়, এই কণাটিই হিগসের নামে হিগস কণা ও ক্ষেত্রের নামকরন করা হয় হিগস ক্ষেত্র। এখন মিথস্ক্রিয়ার মাত্রার উপর ভর নির্ভর করে, বেশী ভরের কণা অর্থাৎ হিগস ক্ষেত্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা বেশী, কম ভরের ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা কম। এই যে হিগস ক্ষেত্র বা কণা প্রাথমিক কণা গুলিকে ভর দেয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারন কণাগুলি ভর পেলেই তবে তাদের উপর মহাকর্ষ বল কাজ করতে পারে তারা একত্রিত হয়ে জোট বাঁধতে পারে, ফলে অনু-পরমানু, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু তৈরী হতে পারে। যদিও মহাকর্ষের সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের সম্পর্ক এখনও পরিস্কার নয়। আবার হিগস ক্ষেত্র সব কণাকে ভর দেয় না, সবটা ভরও দেয় না। হিগস মিথস্ক্রিয়ায় শুধু অন্তর্নিহিত ভর পায়, কিন্তু মহাকর্ষ বস্তুর সমগ্র শক্তির উপর কাজ করে, শুধু ভরের উপর নয়। তাই ফোটনের জাড্য ভর শূন্য হলেও মহাকর্ষ কাজ করে কারন ফোটনের শক্তি আছে। আবার প্রোটনের সমস্ত ভর শুধু হিগস মিথস্ক্রিয়া থেকে আসে না, প্রোটন মধ্যস্থ কোয়ার্ক কণাদের বিনিময়কারী গ্লুয়ন কণার গতিশক্তি থেকেও আসে। এই বিষয়গুলির জটিলতার মধ্যে আমরা যাব না, কিন্তু আমরা হিগস বোসন তথা হিগস ক্ষেত্রের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারলাম কারণ হিগসের জন্যই কণারা ভর পায় বলেই মহাকর্ষ কাজ করে ও সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ হিগস কণা না থাকলে অন্যান্য মৌলকণা গুলি ভরহীনভাবে আলোর বেগে এখনও ছুটে বেড়াত, কিছুই সৃষ্টি হত না। এবার আমরা আসব সার্ন গবেষনাগারে হিগস কণার পরীক্ষালব্ধ প্রমাণে যা তোলপাড় করে দিয়েছিল সারা পৃথিবী।

২য় পর্ব

কণা পদার্থবিদ্যার অনেক অমিমাংসিত বিষয়, বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা ফান্ডামেন্টাল কণাসমূহের যে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাহায্যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তাতে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। এ জন্য প্রায় অর্ধশতক আগে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে স্থান পাওয়া হিগস কণার তাত্বিক সম্ভাবনার প্রমাণও হয়ে উঠছিল অত্যন্ত জরুরী। এই মিসিং লিংক পূরণ করার জন্য প্রয়োজন এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা। তত্ত্বানুসারে আলোর গতিতে মুখোমুখি প্রচন্ড শক্তির প্রোটন কণাদের সংঘর্ষ ঘটাতে পারলে অন্যান্য কণার সঙ্গে হিগস কণাও পাওয়া যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন আধুনিকতম ব্যবস্থা যেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী কণা ত্বরণযন্ত্রে এই সংঘর্ষ ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে মিনি বিগ ব্যাং এর মত অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। সার্ন (ইউরোপিয়ান অরগানাইজেশান ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ-CERN) এর গবেষানাগারে পরিকল্পনা করা হল এরকম একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সার্ন গবেষনাগারটি সুইজারল্যান্ডের সুইস-ফ্রান্স সিমান্তে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এই সার্নের তত্বাবধানেই গড়ে তোলা হল এযাবৎকালের বিশ্বের সর্ববৃহৎ যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ১২ ফুট ব্যাসের রিং আকৃতির ২৭ কিমি দীর্ঘ লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (LHC),স্থাপন করা হল মাটির প্রায় ১৭৫ মিটার নিচে। এটি একটি হ্যাড্রন কোলাইডার অর্থাৎ যে যন্ত্রে নিউট্রন, প্রোটন এর মত হ্যাড্রন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এই বিশালাকৃতি টিউবটিকে সর্বক্ষণ - ২৭১.৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বজায় রাখতে ব্যবহার করা হয় তরল হিলিয়াম প্রবাহ। দশ বছর ধরে নির্মিত এই যন্ত্রে নিয়োজিত ছিলেন প্রায় ১০০ দেশের দশ হাজার বিজ্ঞানী যার মধ্যে কলকাতার কয়েকজন বিজ্ঞানীও ছিলেন।

এই লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের দুটি পৃথক টিউবের মধ্যে প্রায় আলোর গতিতে বিপরিত মুখি দুটি অতি উচ্চ শক্তির প্রোটন বিম নির্দিষ্ট অভিমুখে চালনা করা হয়, গাইড করানোর জন্য ব্যবহার করা হয় প্রায় দশ হাজার ম্যাগনেট। এল.এইচ.সি-র ভিতরে চারটি স্থানে প্রোটন বিমের সংঘর্ষ ঘটানোর ব্যবস্থা ও সার্ন এর কন্ট্রোল সেন্টার থেকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা হয়। বিপরীত মুখি ধাবমান বিম দুটিকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে সূচের চেয়েও সুক্ষ করা হলে, অতি ক্ষুদ্র জায়গায় সংঘর্ষের ফলে প্রচন্ড তাপ ও চাপে আকাঙ্খিত ফল অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর সময়কার পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্ভব। এরকম হাজার হাজার কোটি সংঘর্ষে কোটি কোটি কণা উৎপন্ন হলে, প্রতি এক হাজার কোটি সংঘর্ষে একটি হিগস কণা তৈরী হওয়ার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়, তবে প্রাপ্ত কণার স্থায়িত্ব হবে সেকেন্ডের কোটি ভগ্নাংশেরও কম। বিগ ব্যাং এর সময়ের অবস্থা পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা হলে তার প্রথম মাইক্রো সেকেন্ডে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের অবস্থা পর্যবেক্ষনলব্ধ তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে কিভাবে দৃশ্যমান

পদার্থের উৎপত্তি তথা ভর জেনারেট হয়। এল.এইচ.সিতে সংঘর্ষের ফলে যে মিনি বিগ ব্যাং হয় তাতে প্রোটন কণা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যে সমস্ত কণা উৎপন্ন হয় সেগুলি পার্টিকল ডিটেক্টরে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হয়। প্রাপ্ত বিপুল তথ্য বিশ্লেষন করে জানা যাবে অতি স্বল্পায়ু হিগস কণার অস্তিত্ব। কি বিপুল পরিমান তথ্য বিশ্লেষন করতে হয়েছিল সেটা বোঝা যায় দুটি ডিটেক্টরে প্রতি সেকেন্ডে গৃহিত তথ্য সংরক্ষন করতে প্রয়োজনীয় সিডির সংখ্যা থেকে, সেই সংখ্যাটি হল দু লক্ষ।

সার্ন এর lHC চালু করার পর প্রোটন বিম এর সংঘর্ষ ঘটিয়ে প্রাপ্ত তথ্যবিশ্লেষণের কাজ চলতে থাকে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হাজার হাজার বিজ্ঞানীর অনলস প্রচেষ্টায় lHC-র ATLAS ও CMS পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে 126 Gev ভর বিশিষ্ট একটি কণা সনাক্ত করা গেলে সার্ন কতৃপক্ষ ৪-ঠা জুলাই ২০১২, এই পর্যবেক্ষনের কথা জানান ও এটি একটি হিগস কণার অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ বলে ঘোষণা করেন। এরপরও দীর্ঘ নয় মাস ধরে প্রাপ্ত তথ্য থেকে কণা ও তার ধর্মাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন চালিয়ে ১৪ই মার্চ, ২০১৩ প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফৎ পর্যবেক্ষনলব্ধ কণাকে শতকরা একশত ভাগ হিগস বোসন (Standard model like Higgs-Boson) কণা রূপে সনাক্ত করার কথা জানান। সার্ন কতৃপক্ষ আরও জানান হিগস কণার আরও তথ্য বা অন্যান্য প্রকারের হিগস কণার অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাওয়া হবে। এই আবিস্কারের পরে নোবেল কতৃপক্ষ এই কণার তাত্বিক প্রবর্তক রূপে বিজ্ঞানী পিটার হিগস ও বিজ্ঞানী ইংলার্টকে যৌথভাবে ২০১৩ সালের নোবেল পুরষ্কার প্রদান করেন। পরীক্ষাগারে হিগস বোসন কণার অস্তিত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেই হিগস বোসন কণাকে 'ঈশ্বর কণা' নামে অভিহিত করে তাতে ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানচেতনাকে আচ্ছন্ন করার অপচেষ্টা ছাড়া যে কিছু নয়, এবারে সে প্রসঙ্গে আমরা কিছু বলার চেষ্টা করব।

৩য় পর্ব

বিজ্ঞান মহলে প্রচলিত পদ্ধতি প্রকরণ মেনে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক, গবেষকদের অবদান ও পারিপার্শ্বিকতা স্মরণে রেখে সাধারনত বিজ্ঞানের আবিস্কৃত বিষয়গুলির নামকরণ করা হয়ে থাকে। এই ভাবেই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বহু আকাঙ্খিত কণাটি দীর্ঘদিন ধরে তাত্বিক ক্ষেত্রে 'হিগস বোসন' কণা নামে পরিচিতি পেয়ে এসেছে। নামকরণের মধ্য দিয়ে যেমন বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বের স্বীকৃতির স্বাক্ষর মেলে, একইভাবে বিজ্ঞান গবেষণার ধারাবাহিক ইতিহাসেরও কিছুটা প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজের দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের পর যখন হিগস কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে প্রমানিত হল ততদিনে কণাটি 'ঈশ্বর কণা' রূপে জনমানসে এক অদ্ভুদ আলো আঁধারীর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের পথে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না হয়ে বিষয়টি সাধারণের মধ্যে যেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া রূপে প্রতিপন্ন হল। ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে 'ঈশ্বর এক বিশ্বাসের ব্যাপার' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে সব সন্দেহের নিরসন হয় না, বরং বিজ্ঞানের একটা সিলমোহর পেলে সেটা অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। তাই লেডারম্যানের বইটির 'ঈশ্বরকণা' নামকরন তাদের কাছে, হাতে একটা তুরুপের তাস হয়ে দেখা দিল। তারপর পরীক্ষাগারে 'হিগস বোসনের' অস্তিত্বের প্রমাণ মিডিয়ার কল্যাণে ঈশ্বরের সুক্ষতম অস্তিত্বের প্রমাণরূপে জনমানসকে প্রভাবিত করল। অথচ লেডারম্যান কিন্তু বইটির নাম দিতে চেয়েছিলেন #গডড্যাম_পার্টিকল (#Goddamn_Particle)। আসলে দীর্ঘদিন ধরে কণাটির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় বিজ্ঞানী পিটার হিগস বিরক্ত হয়ে একে গডড্যাম পার্টিকল বলতে শুরু করেছিলেন ও বৈজ্ঞানিক মহলে সেটাই মুখে মুখে গডড্যাম পার্টিকল (Goddamn particle অর্থাৎ হতচ্ছাড়া, পাঁজি) বলে প্রচলিত হয়েছিল। শোনা যায় প্রকাশক বইটির নাম গডড্যাম থেকে ড্যাম কেটে দিলেন, বইটির নাম হয়ে গেল 'গড পার্টিকল' স্বভাবতই বইটি পেল অভাবনীয় ব্যাবসায়িক সাফল্য।

'হিগস বোসনের' ঈশ্বরপ্রাপ্তি:

'ঈশ্বরকণা' (The God Particle) বইটির দৌলতে 'হিগস বোসন কণা' নামটি সাধারণ্যে 'ঈশ্বরকণা' নামে প্রচলিত হয়ে গেল। বিষয়টি অনেকেরই ভালো লাগে নি, জানা যায় স্বয়ং পিটার হিগস এতে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, এই অর্থে তাঁকে নাস্তিক বলা যায়। যাইহোক 'হিগস বোসন কণা'র নাম মানুষ না জানলেও 'ঈশ্বর কণা'র নাম বেশ পরিচিতি পেয়ে গেল। তারপর এল সার্ন-এর ঘোষনায় হিগস কণার অস্তিত্বের প্রমাণের মুহূর্ত, প্রচার মাধ্যম ঈশ্বর কণার আবিস্কারের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করল। টিভি, খবরের কাগজ, পত্র পত্রিকায় হিগস কণা প্রতিভাত হল ঈশ্বরকণারূপে। এ যেন বিজ্ঞান গবেষনার এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য নয়, এ হল ঈশ্বর সাধনার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। কষ্টার্জিত হিগস বোসন নামটি চাপা পড়ে গেল ঈশ্বরকণার নীচে, রীতিমত হাইজ্যাক বলা যায় আর কি! অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, নামে কি এসে যায়,

অন্তর্নিহিত সত্যটাই তো আসল, হিগস বোসন কণার নাম 'ঈশ্বর কণা' হলে ক্ষতি কি, কণাটির চরিত্র ধর্ম তো পাল্টে যাচ্ছে না। সংগত প্রশ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু প্রশ্নকর্তার কেন মনে হচ্ছে না কণাটির প্রচলিত নামটিতে তারা সন্তুষ্ট নন কেন, সত্যেন্দ্র নাথ বসু থেকে পিটার হিগস পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রা পথে কণাটি নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের স্বীকৃতি বহন করা নাম কেন তাঁরা অন্য নামে ডাকবেন? আসলে কণাটির 'ঈশ্বর কণা' নাম দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ নেই। কণাটির চরিত্র ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমান হয়নি। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সৌজন্যে 'কণা'টির ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে গেছে! এখানেই তাদের সুক্ষ কৌশল, একটি প্রাকৃতিক বিষয়কে অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিকতার মোড়কে রহস্যময়তা সৃষ্টি করে মানুষের যুক্তিবাদী মানসিকতাকে পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা, বিজ্ঞানমনষ্কতার বিকাশ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। যে চেষ্টা প্রচলিত ধর্মমত গুলি অনবরত করে চলে, সেই চেষ্টাকে বিজ্ঞানের জগতে এনে ফেলা, তাকে কলুষিত করা। অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম ক্ষেত্র বিশেষে নামেও অনেক কিছু এসে যায়। সব থেকে দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানক্ষেত্রে যুক্ত কিছুলোক ঈশ্বরকণা নামটির যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলেছেন যা মানুষের বিজ্ঞান চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেই সাহায্য করে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষনলব্ধ ফলাফল যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিচার বিবেচনা বিশ্লেষন অনুধাবন করে যে বিশেষিকৃত জ্ঞান আমরা অর্জন করি সেটুকুই আমরা জেনেছি বলে দাবি করতে পারি, তার বেশীও নয় কমও নয়। এখানে আত্মগতভাবে কোন আরোপিত ধারণা পোষন প্রকৃতিকে তার সৃষ্টি, বিকাশ, ক্রিয়া পদ্ধতি সব কিছু জানার বোঝার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, আমাদের যুক্তিবোধ প্রগতিমুখি চিন্তাভাবনা সমগ্র প্রকৃতির প্রতিটি রহস্য সন্ধানে উৎসুক হতে ও প্রশ্ন করতে নিরুৎসাহিত করে, ফলস্বরূপ আমরা অজ্ঞনতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হই।

বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঘটনা প্রবাহ, কার্য-কারণ সম্পর্ক সব কিছু জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র স্বচ্ছ স্বাধীন সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে, কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা থেকে নিশ্চেষ্ট হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পন করে নয়। 'ঈশ্বরকণা' সেরকমই একটা মোহ বিস্তারকারী শব্দ যা বিশ্ব প্রকৃতির অপার রহস্য জানার চিরন্তন কৌতুহলী মানুষের মনে কিংবদন্তির সৃষ্টি করেছে যা বিজ্ঞান জগতে নিতান্ত বেমানান। পক্ষান্তরে শব্দটির অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহার হিগস ক্ষেত্রের ক্রিয়ারও যথাযথ মূল্যায়ণ করে না। হিগস কণার আবিস্কার মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের পথে, মহাবিশ্বকে বোঝার পথের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক, সব রহস্য সমাধানের যাদুদন্ড নয়।

বিজ্ঞানী লেডারম্যান ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা বলেন নি, সম্ভবত তিনি অজ্ঞেয়বাদী, তাঁর বইয়ে বর্ণিত ঈশ্বরকণা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি টার্মের অতিরিক্ত কিছু নয়, তবু এধরণের শব্দের ব্যবহার অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে, তাতে লেখক যা বলতে চাননি সেটাও তাঁর বক্তব্য বলে অনেক সময় ধারনা জন্মায়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কোথাও প্রচলিত ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলেছেন বলে জানা নেই। তিনি ঘোষিত নাস্তিকও সম্ভবত নন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর শব্দটির প্রয়োগ করায় কেউ কেউ তাঁকে পরোক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাসী বলার সুযোগ পেয়েছেন। 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' বইটিতে স্টিফেন হকিং "ঈশ্বরের মন বুঝতে পারব" বলায় ভুল বোঝার অবকাশ থাকতে পারে ভেবেই সম্ভবত আবারও বলেছেন, "ঈশ্বরের মন বোঝা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, যদি কোন ঈশ্বর থাকে যা আসলে নেই, তাহলে সেই ঈশ্বরের যা যা জানার সম্ভাবনা,আমরাও তাই জানতে পারব।আমি নাস্তিক।" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দটির অসতর্ক ব্যবহার ভুল বোঝানোর সুযোগ করে দেয় এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ মানুষ যা জানতে পারে ঈশ্বরের জানার দৌড় ততটুকুই, তাহলে 'ঈশ্বর' আর ঈশ্বর থাকলেন কোথায়? "মহাবিশ্বের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই" হকিং এর এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় 'হিগস বোসনের' আবিস্কারে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের উল্লসিত হবার কোন কারণ নেই, বরং অনন্যসাধারণ এই কণাটির আবিস্কারের মধ্য দিয়ে কণা পদার্থ বিজ্ঞান এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা হয়ত হকিং বর্ণিত বহু আকাঙ্খিত "থিয়োরি অফ এভরিথিং" মানুষের আয়ত্বে এনে দেবে, সেদিন হয়ত হিগস কণা ঈশ্বরের জীয়নকাঠি না হয়ে ঈশ্বরের মৃত্যুবাণ রূপে চিহ্নিত হবে।

রামমোহন ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে বাংলার যুক্তিবাদী আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ল কেনো?

-শম্ভুনাথ চার্বাক

বাংলাদেশে ধর্মের বিবর্তন বারবার ঘটেছে। প্রথমে আর্য আগ্রাসন এবং পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার। শশাঙ্কের নির্মম হাত ধরে আবার হিন্দু ধর্মের উত্থান, শৈব শশাঙ্ক অধিকাংশ বৌদ্ধ মঠ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।পাল রাজাদের সময়ে আবার বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার, কিন্তু সেন রাজাদের হাতে পুনরায় হিন্দু ধর্মের উত্থান বাংলা দেখেছে। হিন্দু বৌদ্ধ বৈষ্ণব ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের জাতাকলে বাংলায় রক্ষণশীল ধর্ম মতের জয়জয়কার ঘটেছে।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই বিভিন্ন আন্দোলনের প্রাথমিকভাবে নেতৃত্বে থাকে মধ্যবিত্তেরা। ইংরেজ আগমনের পরে উনবিংশ শতকে বাংলার সামন্তযুগের ভাঙন ও নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্যের অভ্যুদয়কালে কাঁচামালের উৎপাদকের সাথে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রমবিভাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে এবং নগরে শহরে শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। তার ফলে সমাজে এক সুসংবদ্ধ মধ্যবিত্ত জনস্তরের বিকাশ হয়। এই মধ্যবর্তী জনস্তরে ধীরে ধীরে যখন নাগরিকতার বিকাশ হয়, তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারের চেতনাও তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। এই মধ্যবর্তী শ্রেণি থেকেই রামমোহন ডিরোজিও বিদ্যাসাগরেরা নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলার নবজাগরণের। রামমোহনের সতীপ্রথা রদ ও ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা সেই সময় বাংলায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নেয় এবং পরবর্তীকালে বাল্য বিবাহ রদ, বহুবিবাহ বন্ধ, নারী শিক্ষা বিস্তার সহ সামগ্রিক শিক্ষার বিস্তার, কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, বাংলা ভাষা ও গদ্যে প্রাণ সঞ্চার, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিলনের শিক্ষা বিস্তার করা সহ সমস্ত কাজ সমাজে এক বিপ্লব এনে দিয়েছিল। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদের একেশ্বরবাদের আন্দোলন ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বিস্তারও সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু রামমোহনের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মরা সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যেই এই ধর্মকে রেখে দিলেন, সাধারণ বঙ্গ সমাজে এর বিস্তার ঘটালেন না। নারী শিক্ষার ব্যাপারেও তারা ছিলেন সংকীর্ণমনা, নিজেদের বাড়ীর মহিলাদের শিক্ষার জন্য অন্তঃপুরের অবরোধের বাইরে বার করেননি। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও এরা গেলেননা । এই ব্রাহ্মরা যেন ফিসফাস করে সংস্কারের কাজ করতে উৎসাহী, সেভাবে কেউ এগিয়ে এলেননা। ফলে এই ব্রাহ্মধর্ম সাধারণের মধ্যে প্রসার পেলোনা।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন ঝড়ের পাখির মতো, স্বল্প কালের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং বাংলার সমাজ জীবনে ঝড়ের পাখির মতো উত্থান হয়েছিল তাঁর আবার ঝড়ের পাখির মতো মিলিয়ে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে। এই স্বল্প কালে ইয়ং বেঙ্গলের মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে নতুন ভাবনা বঙ্গের যুবকদের মাথায় গুঁজে দিয়েছিলেন।এর ফসল ইয়ং বেঙ্গল এবং তাদের মাধ্যমে সংস্কার।

নবযুগের বাংলায় সমাজ জীবনের স্রোত দুটি স্বতন্ত্রমুখী খাতে প্রবাহিত হয়।একটি সম্মুখগামী উদারপন্থী উন্নতিশীল ধারা, আর একটি পশ্চাদগামী হিন্দুভাবধারী রক্ষণশীল ধারা। এবং আশ্চর্যের বিষয় জীবন এই স্রোতের দুটি ধারার মধ্যে ব্রিটিশের চাটুকার শোভাবাজার রাজবাড়ীর নেতৃত্বে চরম রক্ষণশীল পশ্চাদগামী ধারা সব সময়ই বাংলাদেশে অতীব শক্তিশালী ছিল। এই বাড়ি থেকেই সমস্ত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার সীলমোহর পেত। ১৮৭০ সালের পর থেকে জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তারা অত্যন্ত উগ্রভাবে ঐতিহ্যবাদী হয়ে ওঠেন। এইসব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার – আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং স্বভাবতই তা মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙার উপক্রম করে। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রের এই অসমবিকাশের মধ্যে অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তি রচিত না হওয়ার ফলে চিত্তবিকার ও বিভ্রমই বৃহত্তর সত্য হয়ে উঠেছে এবং নবযুগের নবজাগরণ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উত্থানে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ইউরোপে স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন, কার্ল মার্ক্স ও অন্যান্য মনীষীদের উত্থানে ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলে। সে সময় প্রথম পর্বে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব সমাজকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্বে ১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ পর্যন্ত নেতৃত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন।

কেশব চন্দ্র সেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় চিৎপুরের গোপাল মল্লিকের বাড়িতে নিজের প্রযোজনায় বিধবা বিবাহ নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং বিদ্যাসাগর তা দেখতেও যান। যে সময় বাংলার গৃহবধূরা অবরোধে কড়া প্রহরায় অন্তরীণ

থাকতো সেসময় কেশবচন্দ্র সেন কোলকাতার রাস্তায় সস্ত্রীক এসে দাঁড়ালেন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্মের আচার্য পদে অভিষেক দেখতে জোড়াসাঁকো গেলেন। এটাকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে এক বিপ্লব বলেই চিহ্নিত করা হয়। এটা বন্ধ করার জন্য কেশব সেনের আত্মীয় ও সমাজের রক্ষণশীল নেতারা তাঁর বাড়িতে গুণ্ডা পর্যন্ত পাঠায়, কেশব সেন সেগুলিকে উপেক্ষা করেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো যান। এই ঘটনার পরে ব্রাহ্ম্যরা তাদের স্ত্রীর সাথে বেরোতে শুরু করেন এবং পরে তা হিন্দু সমাজেও তা প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্রের উত্থানকে বাংলার ব্রাহ্ম্য সমাজের নবোত্থানের যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম্যবিদ্যালয়, সঙ্গতসভা, কলিকাতা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে ব্রাহ্ম্য ধর্মের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। এই সময় তিনি সুবক্তা,পুস্তিকা লেখক, সংস্কারকর্মী, ধর্ম প্রচারক ও মানবহিতৈষী বলে সমাজে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬০ --১৮৭২ সাল পর্যন্ত কেশব সেনের জন্য বাংলার সমাজ জীবন প্রব; আলোড়িত হয়। কেশব সেন বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুগামী। তাঁর জন্যই ব্রাহ্ম্যধর্মের আচার্যদের ব্রাহ্মণ্যত্বের সনাতন প্রতীক উপবীত বা পৈতা ত্যাগের কথা বললেন। দেবেন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্বেও তরুণদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। ব্রাহ্ম্যধর্মে অসবর্ণ বিবাহ শুরু হলো ১৮৬২ সালে। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ মনে মনে স্বীকার করতেননা। ব্রহ্মোপাসনার সময় পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও যোগ দেওয়ার অধিকার থাকবে। এইসব সংস্কার প্রাচীনপন্থী দেবেন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেননি, ফলে ব্রাহ্ম্য সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ১৮৭০ এর ফেব্রুয়ারীতে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড যাত্রা করেন র প্রতিভায় ও বাগ্মিতায় ইংরেজ সমাজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সেখানে জনসাধারণের আত্মোন্নতির ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহ এবং শ্রমিক শ্রেণির সচেতন আন্দোলন তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।১৮৭০ এর শেষে কলকাতায় ফিরে এসে ভারত সংস্কার সভা, স্থাপন করেন। এদের কর্মসূচী ছিল সুলভ সাহিত্য প্রকাশ,সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার, দান-দাতব্য সভা।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে কেশবচন্দ্রের চিন্তাধারা ও কাজকর্মে নানারকমের অসঙ্গতি দেখা যায়। তিনি গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই তিনিই এর বিরোধীতা শুরু করলেন।অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্যাবতার সম্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মালো, সে বিষয়েও তিনি আবেগময়ী বক্তব্য রাখা শুরু করলেন এবং নিজেকে অবতার বলে ভাবতে শুরু করলেন। কেবল অবতারবাদ নয়, বৈষ্ণব ভক্তিবাদও তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান শেষ পর্যন্ত খোল-করতাল সহ নগরকীর্তনে বেরোতে শুরু করলেন। নিজেকে অবতার বলে ভাবতে শুরু করলেন। ১৮৭৬ সালে রামকৃষ্ণর সাথে দেখা হতে তিনি মাতৃভাবে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং ব্রাহ্ম্যধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল। ১৮৭২ সালে তিনি নিজের নাবালিকা কন্যা সুনীতিদেবীর কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনাথের সাথে হিন্দুমতে বিবাহ দিলেন। যত তাড়াতাড়ি প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তত দ্রুত প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। কেশবচন্দ্র ও অনেকটাই দায়ী বাংলার যুক্তিবাদী আন্দোলন বিস্তার না হওয়ার। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা সব দক্ষিণেশ্বরে দৌড়তে শুরু করলো এবং ব্রাহ্ম্য ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সাথে মিলিয়ে দিল। এই সময় তরুণ ব্রাহ্ম্যরা সমাজ থেকে বেরিয়ে সমদর্শী নামে একটি দল গঠন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু,দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এদের নেতা, তিনি পুনরায় ব্রাহ্ম্যসমাজকে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সূত্রঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ - বিনয় ঘোষ

রাজা রামমোহন রায়ের কবিতা এবং এক মহান যোগসূত্র

-মলয় দাস

রাজা রামমোহন রায় এক যুগপুরুষ৷ তাঁর কর্মজীবন এবং জীবনবোধের গভীরতা অবাক করে৷ কুসংস্কারের ঘন কুয়াশায় আবৃত সনাতন ভারতীয় চিন্তা নতুন প্রাণস্পর্শে জেগে ওঠে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে৷ পন্ডিতপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় রামমোহন সম্পর্কে বলছেন,

উপনিষৎ পুরাণ হইতে চারি সহস্র বৎসর পূর্বে যে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ওঁকার পুনঃসংস্থাপন করিলেন৷ আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে যে বড় বড় কথা মহারণ্যের মধ্যে পড়িয়া ছিল, তৎসমুদয় উদ্ধার করিলেন৷ সমুদয় বিরুদ্ধবাদীগণকে নিরস্ত্র করিয়া সত্য উদ্ধার করিলেন, দেশীয় ভ্রাতাদিগকে সৎপথ দেখাইলেন৷ (পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, পৃ : ৬)

রামমোহনের আধ্যাত্মিক ভাবনা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বেদবেদান্তের বিবিধ রচনায়, তেমনই বাসা বেঁধেছে তাঁর কবিতায়। তিনি লিখছেন,

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জিত দেহ,
যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান,
রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত,
আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ।(ঐ, পৃ : ৪৩)

প্রশ্ন হল, কি সেই সত্য, কোন সত্যকে আঁকড়ে ধরতে বলছেন রাজা রামমোহন, কোন সত্যের জন্য সবকিছু মানুষ তৃণজ্ঞান করতে পারে? উত্তর অন্বেষণে চলতে চলতে, এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াই। একজন বলছেন,

অনেকে মনে করেন যে, suffering (দুঃখ) এর মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে, কিন্তু একথা সত্য নয়। suffering এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে - তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই ; সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের ভিতর একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে - তার কাছে suffering একটা গৌরবের জিনিষ, সে দুঃখ কষ্টের চাপে মুমূর্ষু না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে ওঠে।

সে গাইছে রবিঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে,

যত দেব প্রাণ   বহে যাবে প্রাণ
        ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে   এত গান আছে
        এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে   এত সাধ আছে
        প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

সেই একজন আর কেউ নন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র, আমাদের নেতাজি। (তরুণের স্বপ্ন, পৃ : ৮, ১৫) দুঃখের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দর -কে উপলব্ধির মহান সনাতন আধ্যাত্মিক চেতনা তমসাচ্ছন্ন পথে আলো দেখিয়েছে তাঁকে। এই সেই সত্য, রামমোহনের ভাবনায় যা ধরা পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে স্বামী বিবেকানন্দ কর্মবীর মানুষগণ সকলেই এই মহত্তম ভাবে মশগুল।

রামমোহন লিখছেন,

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।

ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত,
বাসনা বেড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার,
দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ,
ভাব সত্য নির্বিশেষ,
মরণসময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন।
ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান,
সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।

'সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ' - ভারী সুন্দর এই কথাখানি। বারবার শুনতে ইচ্ছা করে। সৎ-চিৎ -আনন্দ তথা সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি ধরা পড়েছে রামমোহনের এই লেখায়। সত্য -শিব -সুন্দর ভাস্বর হয়ে উঠে তাঁর প্রকাশ ও ভাবনায়। শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ' কবিতা হয়ে ধরা পড়ে তাঁর বর্ণনায়। জগৎ তথা পার্থিবতা অনিত্য (মিথ্যা তথা প্রতিভাসিক সত্তা), একে অতিক্রম করে আমাদের যেতে হবে সেই পরমসত্যের দিকে অর্থাৎ 'ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ' ছেড়ে চলো যাই নিজ নিকেতনে সত্যশিবসুন্দরের দ্বারে। ঋষি শ্রী অরবিন্দের ভাষায় '... towards a Divine life'. ঋষি বাক্যে, 'স্ব অহম্', ঐতরেয় উপনিষদের ভাষায়, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', আর সাধক রামপ্রসাদের গানে,

আপনাতে আপনি থেকো মন
তুমি যেও না কো কারো ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি
শুধু খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ যেমন পরমসত্তার তিনটি অভিন্ন প্রকাশ; জ্ঞান -কর্ম -ভক্তি তেমনই অভিন্ন কেবল আঙ্গিকের তফাৎ। যে রাজা রামমোহন রায় চূড়ান্ত কর্মযোগী, তিনিই আবার তাঁর কবিতায় ধরা পড়েন জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী রূপে। যোগ একই তফাৎ কেবল আঙ্গিকে। সুভাষচন্দ্রের নেতাজি হয়ে ওঠা তাঁর জ্ঞান ও ভক্তিযোগেরই এক পরম প্রকাশ, অন্যরূপে অন্যভাবে। রাজা রামমোহন হতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সবাই একই যোগসূত্রে গাঁথা, তফাৎ কেবল আঙ্গিকে, ভাবে, প্রকাশে। কূপমণ্ডুকতা, ধর্মীয় বিকৃতির চোরা বালিতে তলিয়ে যেতে বসা সনাতন হিন্দুজাতিকে টেনে তুলেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এবং একই পথের পথিকগণ। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আমাদের কল্পনারও অতীত। সবকিছু হারানোর মধ্যে পেয়েছিলেন সবটুকু আনন্দ। অসীমের পানে চেয়েছিলেন বলে অনায়াসে ডিঙিয়ে ছিলেন সসীমতাকে। উপনিষদীয় সত্য সাকার হয়েছিল তাঁদের জীবনচরিতে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলছেন- গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, " স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরোধর্ম ভায়াবহ:"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। (তরুণের স্বপ্ন, পৃ: ১১)

তিনি বলছেন, ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে - কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারন এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎসভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়, - বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য - এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে

ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মণিষীগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি? (ঐ: ১৪)

এরপর লেখা বাহুল্য, আমার আঙ্গুলগুলি আপনা হতেই থেমে যায়...

তথ্যসূত্র :

১. পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

২. শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে - সুনীল রায়

৩. রামকৃষ্ণ কথামৃত

৪. তরুণের স্বপ্ন : সুভাষচন্দ্র বসু

আজকাল আমাদের দেশে দেখবেন, ভালো মানুষেরা বিচ্ছিন্ন। ভালো মানুষদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। তাঁরা একা, পরস্পরকে খুঁজে পায় না। কিন্তু যারা খারাপ, তারা খুব সংঘবদ্ধ। এক শয়তান "হুক্কা হুয়া' দিলেই মুহুর্তেই হাজারো শয়তান "ক্যায়া হুয়া" "ক্যায়া হুয়া "বলে এগিয়ে আসে।

-অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ।

আত্মার অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে? ভূত কি বাস্তব? নাকি পুরোটাই কুসংস্কার?

-চিত্রদীপ সোম

আত্মা নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই অনন্ত রহস্যের আধার এই বিষয়টি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আত্মার। তাছাড়াও আছে প্রচলিত ও লোকায়ত নানা বিশ্বাস। আসুন আজ এসব নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক মুক্ত মনের আলোয়।

আত্মা কী?

সংক্ষেপে বলা যায় মানুষ ও অনান্য প্রানীর শরীরে থাকা যে অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষ তথা অন্য প্রানীর জীবিত থাকার জন্য দায়ী, তাই-ই হলো আত্মা। একটা জীবিত প্রানী নড়তে পারে, শব্দ করতে পারে, স্থানান্তরিত হতে পারে, যা একটা জড়বস্তু বা একটা মৃতদেহ পারে না। আস্তিকরা একেই নাম দিয়েছেন আত্মা। এমনকি উদ্ভিদের মধ্যেও আত্মা আছে, যদিও তাদের মধ্যে প্রানীর লক্ষনগুলো দেখা যায় না।

আত্মার অস্তিত্ব সত্যি আছে কিনা বা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলো কী বলেছে তা নিয়ে আলোচনায় ঢুকবার আগে একটু দেখে নি আত্মার উৎপত্তি মনুষ্যসমাজে কবে থেকে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে আত্মার ধারণা সংগঠিত ধর্মগুলির চেয়ে অনেক প্রাচীন। এমনকি তা ঈশ্বরবাদের আবির্ভাবের চেয়েও প্রাচীন। ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষের মধ্যে অস্পষ্ট রূপে প্রথম আসতে শুরু করে নিয়ান্ডারথাল মানবের সময় থেকে, যা প্রায় পাঁচলক্ষ বছরের পুরানো। কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আরো আগে। কত আগে? সে বিষয়ে সঠিক তথ্য আমরা কেউই জানি না। তবে পন্ডিতেরা বলছেন অন্তর তারো দশ হাজার বছরের পুরানো তো হবেই (এগুলো নিয়ে যদিও বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী তথ্য ও তত্ত্ব আছে)। সম্ভবত আদিম প্রাইমেট থেকে যখন 'বুদ্ধিমান' বিভিন্ন আদিম মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছিলো, আত্মার কল্পনাও তখন থেকেই মানবসমাজে (যদি সেটাকে 'সমাজ' নাম দেওয়া যায়) শুরু হয়।

কোন ঘটনা মানুষকে সাহায্য করেছিলো আত্মার অস্তিত্বের কথা ভাবতে?

এ'ব্যাপারে দুটো জিনিসের কথা পন্ডিতরা তুলে ধরেছেন। এক, আদিম মানুষ লক্ষ করেছিলো জীবন্ত প্রানীর সাথে মৃত প্রানীর বা জড়বস্তুর পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্য কিসের কারণে সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার মতো উপায় তাদের মধ্যে ছিলো ন। ফলে তারা ধারণা করে নেয় 'অলৌকিক' কোনো শক্তিই এর পিছনে দায়ী। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো স্বপ্ন। স্বপ্নে আদিম মানুষরা দেখতো তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন কাজ করছে যেগুলো তারা কখনো করে নি। ফলে তাদের ধারণা হয় দেহের মধ্যে কোনো শক্তিই এগুলোর জন্য দায়ী। ঘুমন্ত অবস্থায় সেই শক্তি শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এসব কাজ করে আবার ঘুম ভাঙার আগে ফিরে আসে। এটাই হলো আত্মা প্রাথমিক ধারনা। কোনো কোনো পন্ডিত এর সাথে জুড়ে দিচ্ছেন রোগের ধারণাকেও। কেন বিভিন্ন রোগ হচ্ছে তা ব্যখ্যা করার উপায় আদিম মানুষের কাছে ছিলো না। ফলে তাদের ধারণা হয় বহিরাগত কোনো খারাপ শক্তি এসে তাদের শরীরের মধ্যের শক্তিটাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এইবকারণেই রোগবাগ হয়। রোগ সারাতে ওঝা ডাকার প্রচলন এই সময় থেকেই শুরু হয় আদিম মানুষের মধ্যে। আদিম বিভিন্ন গুহাচিত্রে অদ্ভুতুড়ে পোষাক পরে নৃত্যরত যেসব মানুষগুলোকে দেখেন, তারাই মানবসমাজের প্রথম ওঝা। ধর্ম বা পুরোহিতের আগমন তখনও হয় নি সমাজে।

আরো একটা কৌতুহলকর বিষয়, মানুষ এইসময় মনে করতো গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, সূর্য চাঁদ প্রত্যেকেরই প্রান অর্থাৎ আত্মা আছে। তাই এসব প্রাকৃতিক শক্তিতে তুষ্ট করার জন্য, অর্থাৎ তাদের আত্মাকে তুষ্ট করার জন্য তারা এসব প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করতো। মনে রাখবেন, হিন্দুদের প্রকৃতিবাদের সাথে এই বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। হিন্দুরা বায়ুর দেবতা বলে মনে করে পবনদেবকে। জলের দেবতা বলে মনে করে বরুনকে। তাই হিন্দুরা ঠিক বায়ু বা জলকে পুজো করে না, করে এইসব প্রাকৃতিক শক্তি গুলোর দায়িত্বে থাকা দেবতাদের, অর্থাৎ পবন বা বরুণকে। কিন্তু আদিমমানুষেরা তা করত না। তারা সরাসরি এসব বায়ু বা জলকেই জীবন্ত প্রানী হিসাবে পুজো করতো (সম্ভব হলে ধর্ম ও জাদুবিশ্বাসের বিবর্তন নিয়ে পরে একদিন কলম ধরবো)।

এই গেলো আত্মার উদ্ভবের ইতিহাস। এবার আশা যাক আত্মা সম্পর্কে কোন ধর্মমত কী বলেছে।এবং এখান থেকেই গ্যাঁড়াকলের শুরু। কারো বর্ণনার সাথে কারো বর্ণনা মেলে না, অথচ সবাই মনে করে তার ধর্মের ব্যখ্যাটাই সঠিক। কেন সঠিক তার অবশ্য কোনো ব্যাখ্যা নেই বিশ্বাসীদের কাছে। সঠিক, ব্যাস।

প্রথমে গীতার কথাতেই আসা যাক। গীতায় বলা হয়েছে

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা।
ন্যন্যনি সংযাতি নবানি দেহি।।
নৈনং শস্ত্রাণি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদায়মত্যাপো ন শোসষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশপষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরলচোহয়ং সনাতনঃ।।
অব্যক্তহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহর্সি।।
(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ২/২২-২৫)

মানেটা কী দাঁড়ালো?
মানুষ যেমন ছিন্ন বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরে, আত্মা তেমমই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে প্রবেশ করে। এই আত্মাকে কোনো অস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, জল ভেজাতে পারে না, বাতাস শুকাতে পারে না। এ হলো শাশ্বত, স্থির ও সনাতন।

মৃত্যুর পর আত্মা তাহলে কোথায় যায়? প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পর ভালো আত্মার স্থান হয় ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার রাজ্যে। আর খারাপ আত্মার স্থান হয় নরকে। পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে এলো কর্মফল তত্ত্ব। হিন্দুরা বিশ্বাস করতে শুরু করলো মানুষের এ জীবনের কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হবে তার। অর্থাৎ ভালো কাজ করলে ব্রাহ্মণ জন্ম, খারাপ কাজ করলে বৈশ্য বা শূদ্র জন্ম, এবং আরো খারাপ কাজ করলে কীটপতঙ্গের জন্ম। প্রথমদিকে সমাজের অনুশাসন বজায় রাখতে, গোষ্ঠী জীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই কর্মফলবাদের উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে তাই হয়ে দাঁড়ায় শ্রেনী শোষনের অস্ত্র। জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখার অস্ত্র। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত শূদ্রদের মাথায় ঢোকানো হয় এ জীবনে তাদের উপর এত অত্যাচার, এত শোষণ নিপীড়নের কারণ তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল। পূর্বজন্মে তারা অনেক পাপ করেছিলো, তারই শাস্তি হিসাবে এজন্মে শূদ্র হয়ে জন্মানো, এই অত্যাচারের মুখোমুখি হওয়া। অতএব শূদ্রদের মাথায় ঢোকানো হলো হে শূদ্ররা, তোমরা তোমাদের উপর এই অমানবিক শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করো না। কারণ এই শোষন, এই অত্যাচার পূর্বনির্দষ্ট। তোমাদের গতজন্মের কর্মফল। এর প্রতিবাদ করলে তোমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হবে। ফলত পরের জন্মে আরো অবনতি হবে তোমাদের। কাজেই কোনো প্রতিবাদ না করে মেনে নাও এই অত্যাচার। তাতে পরের জন্মে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ব্রাহ্মন বা ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্ম নেবে তুমি। ভোগ করবে অসীম সুখ ও ঐশ্বর্য (শূদ্রদের উপর অমানবিক অত্যাচারের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধান নিয়ে পরে একদিন লিখবো নাহয়)।

এভাবেই কর্মান্তরবাদ এদেশে জল ঢেলেছিলো বিদ্রোহের আগুনে। শোষিত শ্রেনীর প্রতিবাদের বর্শার অভিমুখ থেকে নিরাপদ রেখেছিলো শোষক সমাজকে। আর এইকারণেই পৃথিবীর অনান্য দেশে দাসবিদ্রোহ ঘটলেও আধ্যাত্মিকতার পূন্যভুমি এই ভারতে কোনোদিন ঘটে নি কোনো শূদ্র বিদ্রোহ। নিশ্চিন্ত নিরাপদে পাঁচ হাজার বছর ধরে অত্যাচার চালিয়ে গেছে উচ্চবর্ণের লোকেরা।

হিন্দুদের উপনিষদ বারোটি। মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৪০০ অব্দে রচনা হয় এগুলি। ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে যেসমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন তার অনেকগুলিই কঠ উপনিষদ থেকে নেওয়া। কারণ গীতা অনেক পরের রচনা। কঠ উপনিষদে আছে যম ও নচিকেতার কাহিনী। নচিকেতা যমের কাছে আত্মার বিষয়ে জানতে চাইলে কিছুক্ষন অরাজী থাকার পর যম নচিকেতাকে আত্মার অবিনশ্বরতা বিষয়ে জ্ঞান দেন। রথের উদাহরণ দিয়ে সেখানে আত্মার বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়েছে শরীর রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন রশি, বুদ্ধি তার সারথি।

বৃহদারণ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'মনো বৈ ব্রহ্মোতি অমনসো হি কি সাৎ?' (৪/১/৬), অর্থাৎ মনই ব্রহ্মা, মন হীনের কি সিদ্ধ হতে পারে?

মৈত্রী উপনিষদে বলা হয়েছে 'যিনি শুদ্ধ...শান্ত...শাশ্বত, অজাত...তার দ্বারাই এই শরীর চেতন রূপে থাকে। অর্থাৎ আত্মার শুধু শাশ্বতই নয়, আত্মার দ্বারাই চেতনার উৎপত্তি।

ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের আটান্ন সুক্তে আছে

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম।

তত্ত আ বর্তয়ামসী হ ক্ষয়ায় জীবসে।।

যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকম।

তত্ত্ব আ বর্তমায়সী ক্ষয়ায় জোবসে।।

অর্থাৎ, তোমার যে মন অতিদূরে বিবস্বনের পুত্র যমের নিকট তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি। জীবিত হয়ে ইহলোকে বাস করো। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি। তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে বাস করো।

বলাই বাহুল্য, এখানে মন ও আত্মা সমার্থক।

সাংখ্যমতে 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ' (সাংখ্যসূত্র ৫/৬৯ ও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ২/৪২/৪৭)।

আচার্য শংকর তার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন 'মন হলো আত্মার উপাধিস্বরূপ।

শ্রীভাষ্যকার রামানুজের মতে 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ'।

শাক্ত দর্শনে বলা হয়েছে 'মন অন্য নয়, আত্মাই মন' (ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র ১৭/১১৭, ৪৭)

যোগবাশিষ্ঠরামায়নে বলা হয়েছে 'স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই যখন মননশক্তি ধারণ করে, তখন মন বলে অবহিত হয়', অর্থাৎ চৈতন্য বা মনই আত্মা (যোগবাশিষ্ঠ রায়ন, উৎপত্তিপ্রকরণ, ১০০/১৪)।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা' (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখন্ড সং- প্রকাশক নবপত্র, পৃষ্ঠা ১৬২)।

কি মাথা ঘুরছে এতরকম মতবাদ পড়ে? দাঁড়ান বন্ধু। এ তো সবে কলির সন্ধ্যা। শুধু তো হিন্দুধর্মে আত্মার বর্ণনা দিতেই কেটে গেলো এতটা সময়। এরপর আসবে মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও অনান্য আদিবাসী ধর্মের আত্মার বিভিন্ন বর্ণনা। দেখবেন একের সাথে অন্যের কেমন আকাশ পাতাল পার্থক্য। কারো সাথে কারো বক্তব্য মেলে না। এ যায় ডানদিকে তো ও যায় বামে। অথচ অদ্ভুতভাবে সবাই বিশ্বাস করে তার ধর্মের বক্তব্যই একমাত্র সঠিক, বাকি সব মিথ্যা। কেন মিথ্যা, কিভাবে মিথ্যা, কিভাবে জানা গেলো আপনার ধর্মের আত্মার বর্ণনাটাই ঠিক, অনান্য গুলো মিথ্যা, প্রমান করতে পারবেন অনান্য ধর্মের আত্মার বর্ণনা ভুল, ঠিক শুধু। আপনারটি? ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন না। কারণ এর কোনো উত্তর ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে নেই। অথচ এতরকম মতবাদ একইসাথে সত্য হতে পারে না। হয় যেকোনো একটি সত্যি, আর নয়তো সবগুলিই মিথ্যা। কোনটা সত্যি তা প্রমান করার দায় তো আস্তিক ও ধর্মগুরুদের। আমরা শুধু মজা দেখবো। যাই হোক, হিন্দুধর্মের আত্মার বিভিন্ন বর্ণনা তো পড়লেন। এবার একটু যাওয়া যাক অন্য দিকে। দেখা যাক বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও অনান্য বিভিন্ন ধর্মে আত্মার বিষয়ে কী বলা হয়েছে। প্রথমেই আসি আদিবাসীদের আত্মা সম্পর্কিত বিশ্বাসে। এখানেও বারো গেরস্তর তেরো হাঁড়ি। অর্থাৎ কারো ধারণার সাথে কারো ধারণা মেলে না। অথচ প্রত্যেকেই আবার মনে করে তার ধর্মের বা তার কমিউনিটির বিশ্বাসটাই একমাত্র সত্য, বাকি সব মিথ্যা

ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের ধারণা মানুষের ছায়াই হলো তার আত্মা।

কুকি ও মণিপুরের পুরুম সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি করে আত্মা।

বীরহোররা মনে করে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে তিনটি করে আত্মা। তার মিধ্যে একটাকে প্রায়ই দেখা যায়, তা হলো মানুষের ছায়া।

নীলগিরির টোডা সম্প্রদায়ের মানুষের মতে মানুষের আত্মা ঠিক তার মতই দেখতে।

মালয়ের মানুষের বিশ্বাস আত্মার রঙ লাল। আয়তনে তা ভুট্টার দানার মতো।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর ধারণা আত্মা তরল।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে আত্মা থাকে বুকের বামদিকে। আয়তনে খুব ছোট্ট।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো প্রতিটি মানুষের মধ্যে হাত পা ও অনান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে একটা ছোট্ট মানুষ বাস করে। এটাই হলো তার আত্মা।

জাপানীরা বিশ্বাস করে আত্মার রঙ কালো।

চলুন এবার যাই বিদেশের দিকে বা অনান্য ধর্মগুলির দিকে। ইহুদীরা মনে করে প্রাণই আত্মা, আত্মাই প্রাণ। তারা বিশ্বাস করে জিহোবা মানুষের নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণময় আত্মার সঞ্চার করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস আত্মা থাকে হৃদপিন্ডে। সেখান থেকেই শক্তি সঞ্চারিত হয় সারাদেহে। হৃদপিন্ডই থেকেই উৎসারিত হয় চিন্তা, চেতনা, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি (বাস্তবে রক্তসঞ্চালন করা ছাড়া হৃদপিন্ডের কোনো ভূমিকা নেই। চিন্তা চেতনা উৎসারিত হয় মস্তিষ্ক থেকে। এসব গাঁজাখুরি তত্ত্বে বিশ্বাস করবেন না)।
হোমারের সময় ও তার পরবর্তীকালে গ্রীকরা বিশ্বাস করতো শ্বাসই আত্মা। মারা গেলে শ্বাস দেহ থেকে বিচ্যুত হয়। তবে মৃতদেহ যতক্ষন রক্ষিত থাকবে ততক্ষন আত্মা থাকবে মৃতদেহেই। মৃতদেহের সৎকার করার পর আত্মা বাতাসের সাথে মিশে যাবে।
ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে আত্মার বর্ণনা মোটামুটি একই। আত্মা এখানে দেহাতীত একটি স্বত্তা। এবং মৃত্যুর পরে আত্মা বেহেস্তে (স্বর্গ) বা দোজখে (নরকে) যায় এবং শেষ বিচারের দিন অবধি সেখানে অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ ভোগ করে। হিন্দুধর্মের মতো পুনর্জন্মের তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় এই দুই ধর্ম। খ্রীষ্টানরা আবার ভালো আত্মা ও দুষ্ট আত্মা এই দুইপ্রকার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।
আত্মা নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও উপজাতির পরস্পরবিরোধী মতামতগুলো দেখলেন। এবার দেখা যাক সত্যিই আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা সেই প্রশ্নে।
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আত্মা বলতে তাকেই বলা হয়েছে, যে শক্তি আমাদের দেহকে পরিচালনা করে, যা মৃতদেহ বা জড়বস্তু থেকে জীবিত প্রানীকে পৃথক করে। ধর্মগ্রন্থের মতে আমাদের চিন্তা চেতনার উৎস হলো আত্মা। আত্মার কারণেই আমরা চিন্তা করতে পারি, কোনো বিষয়ে ভাবতে পারি, শরীরের নানা মুভমেন্ট, চলন, গমন, বাক নির্গমন করতে পারি ইত্যাদি। অর্থাৎ খুব সোজা কথায় বললে, মনই হলো আত্মা। এখন মন কী? মানুষের শরীর কুচিকুচি করে কাটলেও কিন্তু 'মন' বলে কোনো অঙ্গ দেখা যাবে না। তাহলে আমরা চিন্তাভাবনা করছি কী করে? কী করেই বা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নানা নির্দেশ দিচ্ছি? আসলে পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে। মস্তিষ্কের অত্যন্ত জটিল বিভিন্ন কার্যপ্রনালী, অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ককোষের জটিল সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সুসংহত সিস্টেম আমাদের সাহায্য করছে কোনো বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নানা নির্দেশ দিতে। কিন্তু প্রাচীন মানুষের কাছে আজকের বিজ্ঞানের এই গবেষনালব্ধ জ্ঞানগুলি ছিলো অজানা। মানবশরীরের বিভিন্ন রহস্যও তাদের জানা ছিলো না। জানা ছিলো না স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক কোষের অস্তিত্বের কথা, যার সাহায্যে আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি। প্রান ছিলো তাই তাদের কাছে রহস্যময় একটি বিষয়। ফলে তারা মনে করতো আমাদের শরীরে নিশ্চয়ই এমন কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা আছে যার ফলে আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি, নানারকম অঙ্গসঞ্চালন করতে পারি। কিন্তু আজ আমরা জানি এরকম কোনো সত্ত্বার অস্তিত্ব নয়, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের নানা জটিল ক্রিয়াকলাপই আমাদের চিন্তা চেতনা ও অনান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী। জড়বস্তুর মধ্যে এই মস্তিষ্ক বলে বিষয়টি নেই, নেই অনান্য ক্রিয়াকর্মের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। তাই জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণের লক্ষনও দেখা যায় না। এটাই মূল ব্যাপার। কোনো অতিপ্রাকৃত স্বত্তাকে এর মধ্যে টেনে আনার দরকার নেই। আবার প্রানীদেহের মৃত্যুর সাথে সাথে তার মধ্যে প্রানের বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরও মৃত্যু ঘটে। তারপর তা পোড়ানো হয় আগুনে বা কবর দেওয়া হয় মাটিতে। অর্থাৎ তথাকথিত 'মন'কে হয় আগুনে পোড়ানো হয়, নয় মাটির সাথে মেশানো হয়। এরপর মনের আর কোনো অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় মানে সম্ভব নয় আত্মার অস্তিত্ব থাকাও।
প্রশ্ন উঠবে তাহলে মৃত মানুষের মধ্যে প্রাণের লক্ষন দেখা যায় না কেন। তারও তো সমস্ত স্নায়ুকোষ, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। সোজা উত্তর, শুধু বিভিন্ন অর্গানগুলি থাকলেই হবে না, সেগুলিকে সচল রাখার শক্তি থাকতে হবে। নয়তো প্রাণের লক্ষণ তার মধ্যে থাকবে না। ঠিক যেমন একটা ফ্যানের সমস্ত পার্টস ঠিকঠাক থাকলেও ইলেকট্রিসিটি না থাকলে ফ্যান চলবে না ঠিক তেমনই।
প্রশ্ন উঠবে ফ্যানের ঘুর্ননের জন্য যে শক্তি দরকার তা আসে ইলেকট্রিসিটি থেকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রানের এই শক্তি আসে কোথা থেকে? মৃত্যুর পরেই বা সেই শক্তি কোথায় যায়? উত্তর কোথাও থেকে আসে না। আবার মৃত্যুর পরেও কোথাও যায় না। এটা প্রানেরই নিজস্ব ধর্ম। আগুনের ধর্ম যেমন সমস্ত কিছুকে পোড়ানো, অ্যাসিডের ধর্ম যেমন ধাতুকে গলানো, তেমনই। অ্যাসিডের এই যে ধাতুকে গলানোর ক্ষমতা, এই ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? উত্তর এটা কোথাও থেকে আসার বা কোথাও যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে। এটা অ্যাসিডেরই নিজস্ব ধর্ম। আগুনের এই যে সমস্ত কিছুকে পোড়ানোর যে শক্তি, সেই শক্তি কোথা থেকে আসে? আবার আগুন নিভিয়ে দিলেই বা সেই শক্তি যায় কোথায়? উত্তর কোথা থেকে আসেও না, কোথাও

যায়ও না। পোড়ানোটাই আগুনের সহজাত ধর্ম। ঠিক তেমনি প্রাণেরও সহজাত ধর্মই হলো প্রাণের বিভিন্ন লক্ষন যথা চিন্তাভাবনা করা বা বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পুর্ন জড় উপাদান দিয়ে তৈরী প্রানীদেহে জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত প্রানের লক্ষন আসে কোথা থেকে? উত্তর, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কোনোটার মধ্যেই যেমন জলের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষ অনুপাতে দুটিকে মেশালে তা থেকে জল তৈরী হয়, যার বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ন পৃথক, ঠিক তেমনি জড় উপাদান দিয়ে প্রাণ তৈরী হলেও তার বৈশিষ্ট্য জড় উপাদান থেকে পৃথক।

বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্‌হোতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের সাথে রাজা মিলিন্দের কথোপকথনের একটি বর্ণনা আছে, যাতে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে আত্মার অবিনশ্বর তত্ত্বের অসাড়তাকে।

মিলিন্দ- মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়?

নাগসেন- কোথাও যায় না রাজন। দেহের সাথে সাথে তারও মৃত্যু ঘটে।

রাজা মিলিন্দ সন্দিগ্ন। সন্তুষ্ট নন এই উত্তরে।

নাগসেন বুঝতে পারেন রাজার মনোভাব। বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করেন- মহারাজ, বলতে পারেন, প্রদীপ নেভানোর পর আগুনের শিখা কোথায় যায়?

এবার রাজা মিলিন্দের ভুল ভাঙে। বুঝতে পারেন নাগসেনের তত্ত্বের যথার্থতা।

এরপরেও যারা গাঁইগুঁই করবেন আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে, তাদের জন্য রইলো সরাসরি কিছু প্রশ্ন-

১) বিভিন্ন ধর্মে আত্মার বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতটাই পরস্পরবিরোধী সেগুলি যে তার একটাকে মানতে গেলে বাতিল করতে হয় অন্যগুলো। এখন পৃথিবীর ৪২০০টা ধর্মের ৪২০০ রকম পৃথক পৃথক আত্মার বর্ণনার মধ্যে আপনি ঠিক কোনটিকে মানবেন ও কেন মানবেন? কিসের ভিত্তিতে মানবেন যে আপনার পছন্দের ওই ধর্মের বর্ণনাটাই ঠিক, বাকি সব ভুয়ো? কিভাবে প্রমান করবেন একমাত্র আপনার পছন্দের ধর্মের আত্মার বর্ণনাটাই ঠিক, বাকি সব ভুল? 'অন্ধবিশ্বাস' ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি আপনার কাছে? না নেই। এবং মনে রাখবেন, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোনো বিশ্বাস বা কোনো তত্ত্বের বিন্দুমাত্র দাম নেই, যতক্ষন না সেই বিশ্বাসটি বা সেই তত্ত্বটির যথার্থতা 'প্রমানিত' হচ্ছে। 'প্রমান' বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের কাছে। বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যুক্তি ও প্রমানে। যুক্তি ও প্রমান ছাড়া বিজ্ঞানের দরবারে কোনো তত্ত্ব গ্রহনযোগ্য নয়, তার পিছনে যতবেশী মানুষেরই সমর্থন থাকুক না কেন বা যত বেশীদিন ধরেই সেই বিশ্বাসটি জনমানসে চলে আসুক না কেন।

২) যখন পৃথিবী তথা সৌরমন্ডলের জন্ম হয় নি, তখন আত্মাগুলি কী করছিলো? কোথায় ছিলো? যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই জন্ম হয় নি, বিগ ব্যাং যখন সংগঠিত হয় নি, তখন কোথায় থাকতো আত্মারা? কী করতো তারা তখন?

৩) সৃষ্টির প্রথমে ছিলো মাত্র একটি প্রাণ। অর্থাৎ তার মধ্যে ছিলো মাত্র একটি আত্মা। অথচ আজ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যাই সাতশো কোটি। অনান্য প্রানী ও উদ্ভিদের কথা তো বাদই দিলাম। তাহলে এত প্রানীর মধ্যে এত আত্মা আসলো কোথা থেকে? ওই একটি আত্মা কী ভাগ হয়ে এতগুলো আত্মা হলো? কিন্তু ধর্মগ্রন্থ তো বলছে আত্মাকে কাটা যায় না। আবার আত্মা নাকি নতুন করে জন্মায়ও না বা তার মৃত্যুও হয় না। তাহলে এত জনসংখ্যা ও অনান্য প্রানীসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা কী?

৪) হিন্দুধর্ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রাণী নাকি তার পূর্বজন্মের কর্মফলে এ জন্মে পৃথিবীতে জন্মায়। অর্থাৎ পূর্বজন্মে ভালো কাজ করলে এ জন্মে ব্রাহ্মন বা পূর্বজন্মে খারাপ কাজ করলে এ জন্মে শূদ্র বা পোকামাকড় হয়ে জন্মায় ইত্যাদি। তা পুর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পিছাতে পিছাতে পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিলো সেটি তার কোন পূর্বজন্মের কর্মফলে পৃথিবীতে এসেছিলো?

৫) পৃথিবীতে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় নি, তখন আত্মাগুলো কোথায় স্তূপাকারে রাখা ছিলো? এই সৌরমন্ডলের মধ্যেই, না বাইরে কোথাও? সৌরমন্ডলের মধ্যে রাখা থাকলে ঠিক কোন জায়গায় রাখা ছিলো? বৃহস্পতি আর শনির মাঝে, নাকি মঙ্গল আর শুক্রের মাঝে? নাকি গ্রহানুপুঞ্জের মধ্যে? নাকি অন্য কোথাও? কিভাবে জানলেন ঠিক সেখানেই রাখা ছিলো?

৬) স্বর্গ ও নরক জায়গাগুলি ঠিক কোথায়? সেটি কি সৌরমন্ডলের মধ্যেই, নাকি বাইরে কোথাও? সৌরমন্ডলের মধ্যে হলে ঠিক কোন জায়গায়? বুধ আর মঙ্গলের মাঝখানে, নাকি ইউরেনাস আর নেপচুনের মাঝখানে? নাকি অন্য কোথাও? কারণ বিজ্ঞানীরা সৌরমন্ডলের মধ্যে এরকম কোনো জায়গার খোঁজ পান নি। সৌরমন্ডলের বাইরে হলেই বা ঠিক কোন জায়গায়? কিভাবে জানলেন ঠিক সেই জায়গাতেই স্বর্গ বা নরক আছে? গিয়ে দেখেছেন? শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে আমরা এখন সৌরমন্ডলের বাইরেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের জিনিস দেখতে পাই। কিন্তু এখনও অবধি বিজ্ঞানীরা এরকম কোনো জায়গার খোঁজ পান নি যেটা ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত স্বর্গ বা নরক হতে পারে, যেখানে আত্মারা সব কিলবিল করছে। তাহলে স্বর্গ নরক জায়গাগুলি ঠিক কোথায়?

৭) হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে আত্মাকে আগুনে পোড়ানো যায় না, অস্ত্রে বিদ্ধ করা যায় না, জলে ভেজানো যায় না, আবার এদিকে অনান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মেও নরকে আত্মার শাস্তির বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একটু ভেবে দেখুন তো, যাকে আগুনে পোড়ানো যায় না, অস্ত্রে বিদ্ধ করা যায় না, তাকে আদৌ কোনো শাস্তি দেওয়া সম্ভব কিনা? এগুলো তো সম্পুর্ন স্ববিরোধী কথাবার্তা। কাজেই যদি আপনি গীতায় বর্ণিত আত্মাকে আগুনে না পোড়াতে পারার, অস্ত্রে বিদ্ধ না করতে পারার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনাকে নরকে আত্মাকে শাস্তি দেবার তত্ত্বে অবিশ্বাস করতে হবে, আবার নরকে আত্মার শাস্তির তত্ত্বে বিশ্বাস করলে গীতায় দেওয়া আত্মার তত্ত্বে অবিশ্বাস করতে হবে। দুটো একসাথে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। অথচ মুশকিল হলো হিন্দুধর্মে এই দুই পরস্পরবিরোধী কথা একইসাথে বলা হয়েছে।

কাজেই, এই দীর্ঘ আলোচনার শেষে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আত্মা শুধুমাত্র একটি কুসংস্কার বিশেষ। দেহাতীত আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর আত্মার অস্তিত্ব নেই মানেই অস্তিত্ব নেই ভূতেরও।

"মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও তুমি মানুষ, তুমি সত্য।

— নজরুল

Hate Politics বলে কিছু হয়না, নিরপেক্ষ বলে কিছু হয়না

-সন্ধ্যা মুখার্জী

মাস গেলে মোটা বেতন, শহরের বুকে ৩ বি এইচ কে ফ্ল্যাটে অত্যাধুনিক ফার্নিচার, দামি গাড়ি চেপে স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে কে নিয়ে সপ্তাহান্তে অন্তত একবার আইনক্স তে সিনেমা দেখে ফেরার পথে ম্যাকডোনাল্ড তে ঢুঁ মারা আর বাড়ি ফিরে এসে হালকা করে এসি টা ছেড়ে দিয়ে দামি সোফায় বসে বিশাল বড় এলসিডি টিভির সামনে বসে বনধ, ধর্মঘট, রাস্তায় মিটিং মিছিল এর সমালোচনা করে গুষ্টি উদ্ধার করা। এই তো জীবন কালিদা।

কিন্তু জীবনের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখুন এই সেদিন পর্যন্ত বনধ, ধর্মঘট, রাস্তায় মিটিং মিছিল এর সমালোচনা করা মানুষ গুলো আজ নিজেরাই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। কিছুদিন আগে রাতারাতি চাকরি খুইয়ে ছিলেন জেট এয়ারওয়েজ এর প্রায় ১৭০০০ কর্মী। এক রাতের মধ্যে শহরের বুকে ৩ বি এইচ কে ফ্ল্যাটে র ওই নিশ্চিত জীবন থেকে রাস্তায় মিটিং মিছিল এর ওই অচেনা ময়দানে নামিয়ে দিয়েছিলো ওনাদের। হয়তো ওঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে একটু একটু করে বুঝেছেন রাস্তায় নেমে এইসব আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাটা কতটা, হয়তো বা ওঁরা বুঝছেন ওঁদের ভাষায় সমাজের ওই ছোটোলোক মানুষ গুলো শখ করে পথে নামেন না,পথে নামেন একদম দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই তে।

দেশের গাড়ি শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে, ফেডারেশন অফ অটোমোবাইল ডিলার্স এসোসিয়েশন এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত কয়েক মাসে ৩ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন আগামীদিনে আরো ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন, টেক্সটাইল সেক্টর এর অবস্থা আরো ভয়াভব গত একবছরে ৩৫% উৎপাদন কমেছে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ রুজিরোজগার হারিয়েছেন গত একবছরে, দেশের ৩০ টি ইস্পাত কারখানা বন্ধের মুখে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্থ এন এইচ এম এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ১৩১৮ জন কে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে, ৩ লক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা চলছে রেলতেও, বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থা পার্লে এই আর্থিক মন্দার জেরে তাদের ১০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে। আই টি সেক্টর এর অবস্থাও খুব একটা আশানরুপ নয়, ২০১৮ সালে যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা খাতে ব্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিলো ৬.৭ হারে এবছর সেটি হ্রাস পেয়ে ৩.৮ হওয়ার সম্ভাবনা।

চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়া এই কয়েক লক্ষ কর্মীর প্রায় অধিকাংশই এই সেদিন পর্যন্ত বনধ, ধর্মঘট, রাস্তায় মিটিং মিছিল এর সমালোচনা করে পাড়া মাথাতে তুলতেন।

কিন্তু জীবনের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখুন ওই নিশ্চিত জীবনের ড্রয়িং রুম ছেড়ে ছোটলোকদের ওই আন্দোলনে আজকে ওনারা পা মেলাতে বাধ্য হয়েছেন, খুব কিউট ব্যাপার না?

রেল, বি এস এন এল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো (PSU) কেউ আর সুরক্ষিত নয়। একের পর এক সব শিল্পপতিদের হাতে বেচে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি চাকরিটাও আর মানুষের কাছে সুরক্ষিত নয়।

- তাই ফেসবুক স্টেটাস তে নামের পাশে আপনিI Hate Politics লিখতেই পারেন, সারাদিন সেক্স, পরনিন্দা -পরচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগলেও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে ওসব নোংরা জিনিস বলে আপনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে ই পারেন, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইতে পথে নেমে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে আপনি ডিসগাস্টিং বলে ছোটলোকদের নোংরামি বলে দাগিয়ে দিতেই পারেন, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে গিন্নির হাতের ইলিশ ভাপা খেয়ে হাত চাটতে চাটতে আমি রাজনীতি করিনা কথাটা ১০৮ বার আপনি বলতেই পারেন, কলেজ পাস করার পরও বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই স্কুল সার্ভিস এক্সাম টা দিতে না পেরে পেট চালানোর দায়ে কলকারখানায় কাজ করার পরও আমি রাজনীতি করিনা কথা টা আপনি বলতেই পারেন কিন্তু জেনে রাখুন মশাই এই নিরপেক্ষতার ভনিতা আপনাকে বেশি দিন বাঁচাবে না।

ছোটবেলায় রাখালের বাঘ পড়ার গল্পটা কমবেশি তো সবাই পড়েছিলেন, এই ঘুণ ধরে পচে গলে যাওয়া সমাজের আজকের রাখাল যদি জেট এয়ারওয়েজ এর ওই কর্মীরা হয় কালকের রাখাল যদি বিএসএনএলের কর্মী রা হয় তাহলে জেনে রাখুন আগামীদিনের রাখাল কিন্তু আপনি। তাই আজ না হয় কাল বাঁচতে গেলে পক্ষ আপনাকে নিতেই হবে, এই নিরপেক্ষতার ভনিতা আপনাকে বেশি দিন বাঁচাবে না। আর পক্ষ বলতে তো ২ টো, একদিকে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু মিথ্যে যা কিছু অত্যাচার তার সব কিছু নিরপেক্ষতার ভনিতা করে নিজের শিরদাঁড়া বেচে দিয়ে মেনে নেওয়া আর একদিকে সমাজের ওই উঁচু শ্রেণীর ভাষায় ছোটলোকদের ওই শেষ বিন্দু পর্যন্ত শিরদাঁড়া সোজা রেখে রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে নিজের মতো করে, নিজের সামর্থ অনুযায়ী যা কিছু অন্যায়, যা কিছু মিথ্যে যা কিছু অত্যাচার তার বিরোধিতা করা। তাই বাঁচতে গেলে পক্ষ আপনাকে নিতেই হবে কারণI Hate Politics বলে কিছু হয়না, নিরপেক্ষ বলে কিছু হয়না।

সতীদাহ প্রথা

-ডি. মন্ডল

বিধবাকে তার মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারার প্রথাটি হল সতীদাহ প্রথা। এরিস্টোবুলুস লেখা থেকে বোঝা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের (খ্রিষ্টাব্দ ৪০০) আগে থেকেই এ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন অথর্ববেদে এবং বিষ্ণু স্মৃতিতে প্রতীকী সতীদাহের উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ গুলিতে সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই প্রথা বৃদ্ধি পায়, ১৬৮০-১৮৩০ সালের মধ্যে, কারণ বিধবাদের উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল সেজন্য পরোক্ষভাবে মৃত্যুর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তাদেরকে পরজন্মের সুফল এবং এই মানুষটিকে স্বামী রুপে পেতে পারে এমন সব কিছু বোঝানো হতো। এছাড়া মুসলিম শাসনের অধীনে দাসত্বের কারণে দারিদ্র্যতা এবং চরম লজ্জাজনক পরিণতির পরিবর্তে সম্মানজনক সমাধান হিসাবে অনেকেই সতীদাহ বেছে নেয়।

১৯ শতকের প্রথম দিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই প্রথাটির বিরুদ্ধে কলকাতায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তা সত্ত্বেও ১৮০৩ সালে রাজধানীর ৩০ মাইলের মধ্যে ৪৩৮টি সতীদাহ হয়। এবং ১৮১৫ এবং ১৮১৮ সালের মধ্যে, বাংলায় সতীদাহের ঘটনার সংখ্যা ৩৭৭ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ৮৩৯-এ এসে দাঁড়ায়। অবশেষে কেরির মতো ধর্ম প্রচারক এবং রাম মোহন রায়ের মতো হিন্দু সংস্কারকদের মতামতকে সমর্থন করে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ামের বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে হিন্দু বিধবাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রথাকে ফৌজদারি আদালত কর্তৃক শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণদের সতীদাহ প্রথা চালু রাখার পেছনে কিছু অসৎ উদ্দেশ্য ছিল যেমন..

১) মৃত ব্যক্তির বহু বিধবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না নেওয়ার নোংরা মানসিকতা।

২) সে সময়ে বিধবাদের সম্পত্তি সমাজের নিয়ন্ত্রকগন অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা ভোগ করতে পারত।

৩) জীবন্ত দগ্ধ হওয়া সহ্য করা, সতীমাতার মর্যাদা অর্জন করা।

ভবিষ্যতে ওই গ্রামে ওই সতী মাতার নামে কোন মানুষ ঐ সতীমাতার কাছে প্রার্থনা করলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে এমন ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করেছিল ব্রাহ্মণরাই।

কিন্তু দেখা যেত অনেকেই অল্প বয়সে বিধবা হত, ফলে তারা আরো কিছুদিনের জন্য বেঁচে থাকতে চাইত। এমন সব নারীরা চিতায় ওঠার আগে বেঁকে বসতো। আসলে খুব কম নারীই ছিল যারা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে পরলোকের মোহে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যেত। কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদত, ছেড়ে দিতে বলত। এই আওয়াজ যেন কেউ না শোনে তাই শবযাত্রীরা ঢোল, মাদল, বাঁশির আওয়াজে ভরিয়ে তুলত। অনিচ্ছুক মেয়েদের খাওয়ানো হত আফিম জাতীয় ওষুধ, যেন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কাউকে মাথার পেছন দিকে আঘাত করে অজ্ঞান করা হত। আর বোঝানো হত এই স্ত্রী পরবর্তী জন্মে উঁচু বংশে জন্মাবে, হতে পারবে এই স্বামীরই স্ত্রী।

পরের জন্মের নামে এভাবে ১৫০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে কয়েক হাজার নারীকে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়।

এবার কি বলবেন সতীদাহ প্রথা ছিল স্বেচ্ছামৃত্যু?

না, এটা কোন স্বেচ্ছামৃত্যু ছিলনা এটা ছিল মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হিংস মানসিকতার পরিচয়।

যা সীমাবদ্ধ ছিল: উত্তরে- গাঙ্গেয় উপত্যকা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান; পশ্চিমে- দক্ষিণ কোঙ্কন অঞ্চলে; এবং দক্ষিণে- মাদুরাই ও বিজয়নগরে। ধন্যবাদ জানাই রাজা রামমোহন রায় কে যিনি আমাদের এই হিংস্র পশুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও জাতপাত লুপ্ত হল না কেন?

-জামাল আনসারি

একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশ পদার্পণ করলেও সমাজের বুকে এখনও জাতপাত স্বমহিমায় বিরাজমান! কেন! কারা এই অপমানজনক প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে? অনেকেই হয়তো বলবেন যে,জাতপাতের যা কিছু ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত আছে তা গ্রামাঞ্চলেই বিদ্যমান। শহরের দিকে এটা নেই বললেই চলে।এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমার এক বন্ধু কর্মসূত্রে শহরের এক শিক্ষিত তথাকথিত উঁচুজাতের বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকত। একটি ঘর সাথে একটি বারান্দা। বাকি অংশে ঘর মালিকের পরিবার থাকত।শীতকালের দিন, স্নান করে,বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে রৌদ্রের তাপ গায়ে মেখে তারপর সে বন্ধুটি প্রতিদিনই অফিসে যায়। একদিন শরীর ভালো না থাকায় সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সেদিন আর অফিসে যাবে না। তাই ঘরের ভিতরে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ঘরমালিক বুঝতেই পারে নাই। কিছুক্ষন পর ঘরমালিকের বউ জল দিয়ে বারান্দাটি শুদ্ধ করতে নেমে পড়ে। বন্ধুটি ভিতরে থেকে ঘরমালিক এর কথা স্পষ্ট শুনে পায় —" স্নান করে তো একেবারেই অফিসে গেলেই হত।সে নাই, একবার এখানে বসবেক।একবার ওখানে বসবেক। উচুজতের ছ্যালা হলেও সোভা পাইত। সে নাই,নিচুজাতের ছ্যালা! প্রত্যেক দিন পরিস্কার কর, শুদ্ধ কর, তারপর আমরা টুকু বারান্দায় বসতে পারব। আজ আসুক অমুকের বাবা তারপর দেখাচ্ছি।পরিষ্কার আমি বলে দিব, বাড়িভাড়া দিতে হলে উঁচুজাতের লোককে দাও। এমন নীচু জাতের লোককে দিও না। আমি রোজ রোজ জল দিয়ে বারান্দা শুদ্ধ করতে পারব নাই।"

দুই দিন পর বন্ধুটি আমাকে ফোন জানায়, সে নতুন জায়গায় ঘরভাড়া নিয়েছে।

সত্যিই ভাবা যায়,এই আমাদের গর্বের ভারত! আর কতদিন এই অমানবিক,অপমানজনক জাতপাত প্রথা আমাদের দেশে ঠিকে থাকবে?

> “কোন সম্রাজ কতটা উন্নত তা মাপা যায় সেই সমাজের মহিলাদের অবস্থান দিয়ে।।”
>
> -কার্ল হাইনরিশ মার্কস (৫ই মে ১৮১৮-১৪ই মার্চ ১৮৮৩)

যুক্তির ফাঁদে সর্বশক্তিমান

- সময়

কয়েকদিন আগে ইন্টারনেটে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হটাৎ, একটা পোস্টে চোখ আটকে গেলো। বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে নয়, বরং ঈশ্বরকে দিয়ে বিজ্ঞানকে বিচার করুন। কারণ, বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা সত্য। সত্যিই বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। প্রায়শই নতুন ধারণা পূর্ব ধারণার স্থান দখল করে।

আসলে বিজ্ঞান আমাদের প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে দেখায়নি। বিজ্ঞান আমাদের আর্গুমেন্ট এবং কাউন্টার-আর্গুমেন্টের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে। বিজ্ঞান সত্যিই পরিবর্তনশীল, সে আলোর উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর, ঈশ্বরকে দিয়ে বিজ্ঞানকে বিচার করতে বলেছেন। তা, আপনাদের ঈশ্বর তো নিজেই বিজ্ঞান ও যুক্তির নিয়মে বন্দি! কীভাবে?

আচ্ছা, প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। God is almighty.....। তা, এই সর্বশক্তিমান ব্যক্তিটি কি এমন একটি পাথর তৈরি করতে পারে, যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেননা?

যদি উত্তরটা হ্যাঁ হয়, তাহলে জগতে এমন কাজ তৈরি হবে, যা স্বয়ং ঈশ্বর ও করতে পারবেননা। আর, উত্তরটা যদি না হয়, তাহলেও বিশ্বে এমন কাজ থাকবে, যা স্বয়ং ঈশ্বর ও করতে পারবেননা। তাহলে, ঈশ্বর কি আদৌ সর্বশক্তিমান থাকলেন? এই প্রশ্নের মাধ্যমেই জন্ম হয় The Omnipotence Paradox নামের পৃথিবী বিখ্যাত (অথবা, ধর্মান্ধদের কাছে কুখ্যাত) কূটাভাসের। এই সাধারণ একটি প্রশ্ন, কোনো সর্বশক্তিমান স্বতার অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণার ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম। তাহলে এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে ঈশ্বর আদপে সর্বশক্তিমান নন। যৌক্তিক ভাবে যেই সকল কাজ করা সম্ভব হবে, শুধুমাত্র সেই সব কাজ করতেই তিনি সক্ষম। যুক্তির খন্ডন কেউ করতে পারেনা।

সুতরাং, আমাদের মতন সাধারণ মানুষদের ন্যায় ঈশ্বর নিজেও যুক্তির বাঁধনে বন্দি, গণিতের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এবার তাহলে বলবেন যে গণিত তো আসলে ঈশ্বরেরই অংশ। পয়েন্টে আসুন। তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে বিজ্ঞানকে দিয়ে ঈশ্বরকে নয়, বরং ঈশ্বরকে দিয়ে বিজ্ঞানকে বিচার করুন - এই সব কথা বোগাস! গণিত ও বিজ্ঞান যদি ঈশ্বরেরই অংশ হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক তত্ব ছেড়ে অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছেন কেন?

ধর্মের আফিমে আচ্ছন্ন না থেকে যুক্তির আলোয় প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মের মাধ্যমে আমরা-ওরার বিভাজন তৈরি করার চেষ্টায় আছে, বলা যায় আংশিক সফল। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোর তলায় আমরা সবাই এক। তাই, যুক্তির মাধ্যমে প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মান্ধতাকে খন্ডন করে চোখের ঠুলিটা খুলুন, দেখবেন জ্ঞানের আলোয় জগৎ কতটা উজ্জ্বল.....

বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি নিয়ে আজও প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা হিন্দুদের

-রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সন্ধ্যেয় মাথার ওপর মশারা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করা না পর্যন্ত খেলা চলত আমাদের। দুই ক্লাসমেট হাসানুল্লা আর তফিকুল ফুটবল ম্যাচে এক টিমে থাকলে বড় ভরসা ছিল। বাবা স্টেশন যাতায়াত করত পাশের মুসলমান পাড়ার খয়রুল বা গোলাপের রিক্সায়। পাশের বাড়িতে কাজ করত মকবুল। ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে উঠলে ঘুরে বেড়াতাম হাটে, বাগানে। যতদূর মনে পড়ে, মকবুলের বিয়ে হয়েছিল আমাদের প্রাইমারি স্কুলের এক ক্লাসমেটের সঙ্গে। আমার কলেজ পড়ুয়া দিদি ছুটিতে গ্রামে এলে তাঁকে পড়াতে আসতেন শের মহম্মদ মাস্টারমশাই।

ছোটবেলায় শোনা সবচেয়ে খারাপ কথাটি ছিল, 'ও কি বাঙালি, না মুসলমান?' নজরুলের জন্মদিনের সপ্তাহে নজরুল পক্ষে এসে খেয়াল করি, সেই খারাপ কথাটির মৃত্যু ঘটেনি। এখনও সেই আজব কথা বলার মতো শিক্ষিত লোক অনেক। এখনও অনেকে সবিস্ময় হাততালি দিতে থাকে, বাঙালি মুসলিম পরিবারে রবীন্দ্র চর্চা হয় শুনে। এখনও যেন ওই আমলে পড়ে রয়েছি। যেখানে শৈশবের মতো হ্যাজাক-লণ্ঠন-ল্যাম্পই জ্বলে। মাঝে মাঝে আলো চলে যায়। অনেকে চেঁচিযে বলে, 'জ্যোতিবাবু গেলেন।'

কে এঁদের বোঝাবে, হিন্দুদের মতো বাঙালি মুসলমানও কিশলয়-বর্ণপরিচয় পড়ে বড় হয়েছে। তারাও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক। পাড়ায় বীরপুরুষ বা লিচু চোর আবৃত্তি করেছে। স্কুলে অমল বা দইওয়ালা সেজেছে ডাকঘর নাটকে। বড়দের বিসর্জন, কালমৃগয়া দেখে শুনে নাটক বা গীতিনাট্য মুখস্থ করেছে। পঁচিশে বৈশাখে প্রভাতফেরিতে গলা মিলিয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। আমাদের স্কুলে আবার শুক্রবার টিফিন ছিল এক ঘণ্টার--নমাজ পরার জন্য। অক্সফোর্ডের গবেষক, কালিয়াচকের ছেলে শাহনওয়াজ আলি রায়হান সেদিন লন্ডন থেকে ফোনে হাসল, 'তুই বাঙালি না মুসলমান, প্রশ্নটা মালদা-মুর্শিদাবাদে কোনওদিন শুনতে হয়নি। শুনেছি বড় হযে কলকাতা গিয়ে।'

সেই কলকাতা---রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর এলাকায় উর্দুভাষী মুসলিম অনেক বেশি। বিহার, উত্তরপ্রদেশের মুসলিমরা বেশি সেখানে। তাই কলকাত্তাইয়াদের বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা কম। কলকাতা আমাদের সংস্কৃতি ও রাজনীতির চাবুক হাতে ঘুরে বেড়ায়, জেলা শহরগুলো বিদ্রোহ না করে তার হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে রাখে কেন? তাই 'সংস্কৃতিবান' কলকাতা থেকে ভুল ধারণা ছড়াতে থাকে বাঙালি মুসলিম-হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে। সব পার্টির নেতারাও দায়িত্ব নেন। বরং জেলাগুলোয় এই সমস্যা কম। একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে, একই ক্লাবে খেলে পরস্পরের জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা স্পষ্ট। শাহনওয়াজের স্ত্রী ইংল্যান্ডে ডাক্তারি করেন। তাঁরা ছোটবেলায় ছুটিতে হুগলি থেকে দল বেঁধে যেতেন শান্তিনিকেতন ঘুরতে। তাই মুসলিম ছেলের মুখে রবি ঠাকুর আবৃত্তি শুনলে জেলার হিন্দুরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় না। অনেক মুসলিম শিক্ষক বাংলা পড়ান স্কুলে-কলেজে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল, জীবনানন্দ তো তাঁদের বুকের মধ্যে গাঁথা। এপারে পত্রিকায় ঈদ সংখ্যা হয় না বলে, তীব্র অভিমান আছে। তবু পুজো সংখ্যা নিয়ে টানাটানি করেন। পুরোনো পুজোর গানে আজও ঘোর।

বাঙালির মৃতপ্রায় ঐতিহ্য ফুটবল আইসিইউতে অক্সিজেন পাচ্ছে বাঙালি মুসলিমদের সৌজন্যে। মইদুল-নাসির-নাজিমুল থেকে মেহতাব-নবি, রফিক-রহিম আলি-ফারদিন আলি মোল্লা। ঘাটালের দাশপুরের ছেলে মইদুল প্রথম বাঙালি মুসলিম তারকা ফুটবলার। তাঁর বাড়িতেই অনেক হিন্দু-মুসলিম বিযে হয়েছে। স্ত্রীও হিন্দু। মইদুল সহাস্য, 'আমরা তো ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মধ্যে বড় হয়েছি। এক পাড়ায় বাড়ি ছিল। ওদের বাড়িতে গিয়ে খেতাম।' অথচ আজ, কলকাতায় এখনও বাঙালি মুসলিমের ঘর ভাড়া পাওয়া কঠিন। শিলিগুড়িতেও।

গ্রামবাংলায় বড় হওয়া বাঙালি মুসলিমরা বিরিযানির কথা শোনেননি অনেকদিন। ফিরনির কথাও। হালিম এখনও অপরিচিত খাবার উত্তরবঙ্গে। শাহি টুকরাও। তাঁরা তো একেবারে হিন্দুদের মতোই মাছ-ভাত-ডাল-তরকারি-ছ্যাঁচড়া-দই-বোঁদে-রসগোল্লা খেযে বড় হয়েছেন। বিযোড়িতে হত ঘি ভাত, লোকে বলত পোলাও। সংস্কৃতি থেকে জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস থেকে পোশাক-সব ব্যাপারেই বাঙালি হিন্দু-মুসলিম এক। ব্যাপারটা বুঝতে আজও অনেকের ভুল হয়। মালদার দিকে এখনও শের শাহের সৈন্যদের বংশধররা রয়েছেন, শের শাহ বাদিযা বলে তাঁদের। মুর্শিদাবাদে পাবেন মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সঙ্গে আসা আফগান সেনার উত্তরসূরিদের। দুপক্ষেরই বাংলা সংস্কৃতিতে বড় হওয়া। মালদার সুলতাননগরে মুসলিম গ্রামে এখনও রয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রীর নামে লাইব্রেরি।

বসিরহাট ও একবালপুরে বড় হওয়া, বিশিষ্ট গায়ক কাজি কামাল নাসের গান বেঁধেছিলেন, 'যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আজও সেখানেই দাঁড়িযে আছি/ প্রতিবেশী হযে দুজন কেন এলাম না কাছাকাছি।' মেদিনীপুরের মইদুল, মালদার শাহনওযাজের মতো তাঁরও এক অভিজ্ঞতা। জেলার তুলনায় কলকাতাতেই এই বিভেদমূলক কথাবার্তা বেশি। এখনও একটা স্মৃতি ভোলেননি কামাল। বাসে যাচ্ছেন ববি হাকিম কলকাতার মেয়র হওয়ার দিন। এক সহযাত্রী আরেকজনকে বলছেন, 'শেষ পর্যন্ত মুসলমানকে কলকাতার মেয়র করে দিল।' ডালহৌসীর অফিসে পাশের সহকর্মী কাগজে পাকিস্তানের খারাপ খবর বেরোলেই গোল দাগ দিয়ে আড়চোখে তাকাতেন কামালের দিকে।

এপার বাংলার হিন্দু-মুসলিমদের আর একটা বড় মিল দেখতে পাই পড়শি বাংলাদেশের দিকে তাকালে। কোথাও কি আমরা দুপক্ষই একটু ঘরকুনো, নিজস্ব বৃত্তে স্বচ্ছন্দ, বেহিসেবি ছক ভাঙায় অবিশ্বাসী মানুষ? একটু ভীরু, একটু নরম ও কম পরিশ্রমী? বাংলাদেশিরা ক্রমাগত বিদেশ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। বেআইনি পথে, আইনি পথে। সমুদ্রে জাহাজের খোলে লুকিয়ে ইউরোপ যেতে গিযে অনেকে যেমন চিরকালের জন্য হারিযে গিয়েছেন, তেমনই পর্তুগাল-স্পেনের এক একটা জায়গায় বিশাল সম্পত্তি কিনে ওপারের বাঙালিরা বানিয়ে ফেলছেন ছোটখাটো উপনিবেশ। লন্ডন-নিউ ইয়র্কের বাজার তাঁদের জন্যই ভরে উঠেছে বাঙালি খাবারে। বিশ্বে এমন ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছেন তাঁরা, অজস্র বিদেশি মুদ্রা আসছে দেশে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্স অর্থনীতি পৌঁছে যাচ্ছে অন্য উচ্চতায়। ১৯৯০-৯১ সালে বছরে ৭৬৩.৯১ মিলিয়ন ডলার অর্থ এসেছিল সে দেশে। ২০১৯-২০ সালে অঙ্কটা ১৮২০৫.০১ মিলিয়ন।

পদ্মাপারের বাঙালি কোনও দেশে আস্তানা পেলে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে চেনা আত্মীয় বন্ধুদের। যা মনে করায় মালযালি, তামিল বা পাঞ্জাবিদের। কেরল যেমন আরবের সোনায় ফুলে ফেঁপে উঠছে, বাংলাদেশও তাই। সৌদি আরব ও আমিরশাহি থেকে সবচেযে বেশি বিদেশি মুদ্রা আসে ঢাকায়। তারপর আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কাতার থেকে। আমাদের এখানে বাঙালি মুসলিমরাও ঘর ছাড়েন চাকরির খোঁজে। গন্তব্য ভিনরাজ্য। অধিকাংশই শ্রমিকের কাজ। এখনও কিন্তু তাঁদের মাথায় বিদেশ নেই। কী জানি, মনে হয়, গঙ্গা পারের তুলনায় পদ্মাপারের হাওযায় সাহস শব্দটা বেশি ওড়ে। হয়তো যুদ্ধ এবং নতুন দেশের প্রাথমিক চরম দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ওপারের বাঙালি মুসলিমের মনের মরিযা ভাবকে আরও আগুন দিয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বড় হযে উত্তরবঙ্গে কাজে আসা এক বাঙালি মুসলিম তরুণ বলছিলেন, 'পাড়ায় বড় হওযা আর মহল্লায় বড় হওযার মধ্যে মনোভাবের ফারাক হয়।' কথাটা নির্মম সত্যি। পাড়ায় সবার সঙ্গে বড় হলে উদারতা জন্মায় সব পক্ষেরই। প্রত্যেক গোষ্ঠীর আলাদা মহল্লা হলে বিচ্ছিন্নতার দড়িটা বেড়ে যেতে থাকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। উত্তরবঙ্গেই একটা সময় জাঁদরেল মুসলিম নেতা ছিলেন, যাঁরা পুরো বঙ্গে পরিচিত। মালদায় গণি খান, দিনাজপুরে জয়নাল আবেদিন, কোচবিহারে ফজলে হক। গঙ্গা পেরোলে মুর্শিদাবাদে আবদুস সাত্তার। তাঁরা হিন্দু না মুসলিম, গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাঙালি পরিচয়ই ছিল আসল। ফজলে ছাড়া সবাই প্রযাত। ছয় বছর আগে বাংলার মুসলিমদের সামগ্রিক দুরবস্থার যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন অমর্ত্য সেন, তা এই নেতাদের লজ্জায় ফেলার মতো। তথ্য বলছিল, বাংলায় যেখানে এক লাখ লোক পিছু ১০. ৬ পিছু মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, সেখানে মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরে এই হার ৭.২, ৮.৫, ৬.২।

এখন শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে সাধারণ মুসলিম যখন বাংলা পড়াতে মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠান, অনেক নেতা তখন সন্তানদের পাঠান মাদ্রাসায়। জেনে মাথায় ঘোরে আর একটা তথ্য। ওপারের বাঙালি মুসলিম এখনও অক্সফোর্ডে পড়তে গেলেও নিজেরা বাংলায় কথা বলে, বাংলাভাষা বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ পারের বাঙালির কোনও পক্ষই সেটা করে না। এখানে হিন্দু-মুসলিম, কলকাতা-জেলার খুব মিল।

আমাদের স্কুলে পণ্ডিত মশাই ছিলেন, ছিলেন মৌলভী মাস্টার মশাইও। সংস্কৃত পড়াতেন একজন, অন্যজন আরবি। স্কুল ছুটির পর শুধু উড়নি গায়ে পণ্ডিত মশাই বাড়ি ফিরতেন হাঁটতে হাঁটতে। পাশে সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর যেতেন পাজামা, ফেজ টুপি পরা মৌলভী মাস্টারমশাই। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান জানাতে। সেই দৃশ্যটা আজও চোখে ভাসে। যাবতীয় সব যন্ত্রণা মুছে যায় তখন।"

আত্মা-কথা

-সৌরভ কুমার মান্না(Erich D)

আত্মা- এই শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত।আত্মা নিয়ে প্রচলিত ধারনা এই যে,আত্মা এমন কিছু যেটা জীবিত অবস্থায় শরীরে থাকে কিন্তু মৃত্যুর পরে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।আত্মা বিষয়ে বিশ্বাসী শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের আত্মার অস্তিত্বের দাবিতে অনড় থাকতে "Conservation of Energy " থিওরি এর আশ্রয় নেন।এই থিওরি মতে Energy neither be created, nor be destroyed. It can only transform one form to another। তারা বলতে চান জীবিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে যে এনার্জি, মৃত্যুর পর সেটা কোথায় যায়? আসুন এই দাবিকে কয়েকটা প্রশ্ন করি।

*ধরুন আপনাকে কেউ একটা মাঠে দশপাক দৌড়োতে বলল। দৌড়ানোর আগে আপনার যা এনার্জি লেভেল ছিলো, দৌড়ানোর পর সেই লেভেল খানিকটা কমতে বাধ্য। দাবি অনুযায়ী আপনার আত্মার সাইজ খানিকটা কমে যায়।

*মানুষের আত্মা থাকলে পশু-পাখি,ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন,জুপ্ল্যাঙ্কটন,জেলিফিশ,বাঁদর, সাপ, ছাগল এদেরও আত্মা থাকতে বাধ্য।এবার প্রশ্ন হলো মানুষের মতো এদের তো শ্রাদ্ধজাতীয় কাজ করা হয়না,এদের আত্মাও কি সবাইকে ভয় দেখাতে পারে,এদের আত্মাদের ও কি মুখে পোড়া ডিমভাজা লাগানোর মতো ভয়ংকর দেখতে?

*২০০০ সালে পৃথিবীর যা জনসংখ্যা ছিলো, ২০২২ এ তা অনেকটাই বেড়েছে।বেঁচে থাকতে গেলে যদি আত্মা compulsory হয়,তাহলে প্রশ্ন হলো এই এক্সট্রা আত্মাগুলো এলো কোত্থেকে?

অবশেষে বলা যাক,আত্মা বলে আদতেই কোনোদিন কিছু ছিলোনা এবং কোনোদিন থাকবেও না।এনার্জির বিভিন্ন form হয়। বিজ্ঞান পড়লে তা জানা যায়।শরীরে iron এর কমতি হলে যেমন iron rod এর ওপর শুয়ে থেকে কোনো লাভ হয়না, Energy এর ও সেরকমই আলাদা আলাদা form আছে। যেটা কল্পিত আত্মা কোনোদিনই নয়।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী পিটার হিগস ও হিগস বোসন কণা

– মুক্তচিন্তক অভিজিৎ রায়

সেই ষাটের দশক থেকে কণা পদার্থবিজ্ঞানের স্টান্ডার্ড মডেলের একটা জোরালো অনুমিতি ছিল যে আমাদের এই চিরচেনা মহাবিশ্ব হিগস-কণাদের সমন্বয়ে গঠিত হিগস-ক্ষেত্রের (Higgs field) এক অথই সমুদ্রে ভাসছে। এই অথই সমুদ্রে চলতে গিয়েই নাকি উপ-পারমাণবিক বস্তুকণারা সব ভর অর্জন করে। যদি হিগস-ক্ষেত্র বলে কিছু না থাকত, তাহলে কোনো বস্তুকণারই ভর বলে কিছু থাকত না– তা সে রোগাপটকা ইলেকট্রনই হোক, আর হোঁৎকামুখো হিপোপটেমাস, মানে টপ-কোয়ার্কই হোক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেবলমাত্র হিগস-ফিল্ড বলে কিছু একটা আছে বলেই এসব কণা ভর অর্জন করতে পারছে, যা আবার ফলশ্রুতিতে তৈরি করতে পারছে আমাদের গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথসহ সবকিছুই।

চিন্তা করে দেখুন, আমরা ফোটনের মতো ভরহীন কণার কথা জানি যারা ছোটে আলোর বেগে। আলোর বেগে ছুটতে পারে, কারণ এরা হিগস-ফিল্ডের সঙ্গে কোনো ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় না। হিগস-ক্ষেত্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় না জড়ানোর কারণে তারা থেকে যায় ভরহীন। আর ভর-টরের ঝামেলা নেই বলেই তারা অমনি বেগে হু হু করে ছুটতে পারে।

কিন্তু ওভাবে ছুটলে কী হবে, তারা জোট বাঁধতে পারে না কারও সঙ্গেই। জোট বাঁধতে হলে ভর থাকা চাই। এই যে আমাদের চারপাশে এত বস্তুকণার সমারোহ দেখি, দেখি পাহাড় পর্বত, নদীনালা, গাছপালা আর মানুষ-– সবারই অল্পবিস্তর ভর রয়েছে। ভর জিনিসটা তাই আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে আমরা মনে করি।

তাই কোনো কণা যদি পাওয়া যায় যেটা মহাবিশ্বের শুরুর মুহূর্তে সবাইকে ভর প্রদান করছে, করছে অস্তিত্বহীনকে অস্তিমান, তার গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিসীম। বহু বছর আগে ১৯৬৪ সালের দিকে পিটার হিগস নামে এক বিজ্ঞানী ধারণা করেছিলেন এই ধরনের এক 'হাইপোথিটিক্যাল কণা'র।

যদিও ধারণাটির পিছনে কেবল পিটার হিগসের একার অবদানই ছিল তা নয়, এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন রবার্ট ব্রাউট এবং ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্টের মত বিজ্ঞানীরাও; তারপরেও এক ধরনের কণা দিয়ে তৈরি ফিল্ডের ব্যাপারটা হিগসের মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল বলে অনেকে ভেবেছিলেন। তাই তার নামানুসারেই এই অনুকল্প-কণাটির নাম দেওয়া হয় হিগস-কণা।

যদি এ নামকরণ থেকে কেউ ধরে নেন যে, হিগস-কণার অনুকল্প যাদের মাথা থেকে এসেছে সেসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে পিটার হিগসের অবদানই ছিল সর্বাধিক, তাই তার নামে কণাটির নামকরণ করা হয়েছে– তাহলে কিন্তু ভুল উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া হবে।

আসলে ১৯৬৪ সালে হিগসের ধারণাসূচক যে তিনটি মহামূল্যবান পেপার প্রকাশের কথা বলা হয়, তার মধ্যে হিগসের পেপারটি ছিল দ্বিতীয়। হিগসের আগে বেলজীয় পদার্থবিদ রবার্ট ব্রাউট এবং ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্টের একটি পেপার প্রকাশিত হয়। আর হিগসের পেপারটির পরে জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন এবং টমকিব্বল-এর আরও একটি পেপার প্রকাশিত হয়।

প্রতিসাম্যতার ভাঙনের জন্য দায়ী 'হিগস-প্রক্রিয়া' হিসেবে যে প্রক্রিয়াটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেটার পেছনে এদের সবারই কমবেশি অবদান আছে। এমনকি তাদের কাজের আগে জাপানি-আমেরিকান পদার্থবিদ ইয়োইচিরো নামবু এবং ভূতপূর্ব বেল ল্যাবের ফিলিপ অ্যান্ডারসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে দেয়।

এদের সকলের অবদানই উল্লেখযোগ্য। তারপরেও কেবল পিটার হিগসের নামেই কেন হিগস-কণা, হিগস-ক্ষেত্র, হিগস-প্রক্রিয়া সবকিছুর নামকরণ হল এটা একটা মূর্তিমান রহস্য। পিটার হিগস নিজেই নিজের নামে কণাটির নামকরণ করেননি এটা নিশ্চিত। অনেকেই এই নামের জন্য আঙুল তুলেন মেধাবী কোরিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিদ বেঞ্জামিন লীর প্রতি, যিনি ১৯৭৭ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, হিগসের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং এই আলাপ থেকে তিনি প্রতিসাম্যতার ভাঙনের মাধ্যমে কীভাবে কণারা ভরপ্রাপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

এই সূত্র ধরে উৎসাহী লী বেশ কিছু সেমিনারে সেটাকে 'হিগস-মেকানিজম' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের ১৯৬৭ সালের গুরুত্বপূর্ণ একটি পেপারে ভুলক্রমে রেফারেন্সে পিটার হিগসের নাম অন্যদের আগে চলে যায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে।

এগুলোর বাইরে 'হিগস-বোসন' শব্দটির দ্যোতনা শ্রুতিমধুর, উচ্চারণও সহজ। এসব কিছুই এই নামের পক্ষে গেছে।

কিন্তু নাম দিলে কী হবে, সে কণার কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা কখনওই দিতে পারেননি, অন্তত ২০১২ সালের আগ পর্যন্ত।

২০১২ সালে এই হারানো টুকরা খুঁজে পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সার্নের বিজ্ঞানীরা তাদের বিশাল ব্যয়বহুল কণা ত্বরক লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার থেকে পাওয়া প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার এক বিশাল যন্ত্রদানব।

দানবাকৃতির লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার দিয়ে প্রমাণ হল হিগসের অস্তিত্ব

আমাদের কোনো ধারণাতেও আসবে না কতটা বিশাল। জেনেভার সীমান্তে জুরা পাহাড় বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নানা কায়দা-কসরত করে মাটির পঞ্চাশ থেকে একশ পঞ্চাশ মিটার (মানে প্রায় ১৬৫ ফুট থেকে পাঁচশ ফুট) নিচে ২৭ কিলোমিটার (মানে প্রায় সাড়ে সতের মাইল) পরিধির ধাতব এক টিউব বসানো হয়েছে। সেখানেই এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করেছেন বিজ্ঞানীরা।

বলাবাহুল্য, এই লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার নামের দানবটা শুধু সুইজারল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুইজারল্যান্ডের লেক জেনেভার নিচ দিয়ে চলে গেছে একেবারে ফ্রান্স অব্দি। সেখানেই বিজ্ঞানীরা পেলেন হিগস কণার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কীভাবে তারা এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করলেন, এ নিয়ে সাদামাটা ভাষায় কিছু বলা যাক।

আমাদের মহাবিশ্ব যদি হিগসের অথই সমুদ্রে ভাসমান থাকে আর সেই সমুদ্র যদি হিগস-কণাদের দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলে সেখান থেকে কিছু কণা বেরিয়ে আসতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে প্রচণ্ড গতিতে দুটো সাবমেরিনের সংঘর্ষ হলে যেমন কিছু জল ছিটকে চলে আসে উপরে, আর তা দেখে আমরা বুঝি নিশ্চয়ই জলের র নিচে কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তেমনি ব্যাপার হবে হিগস-মহাসাগরের ক্ষেত্রেও। হিগস-কণা পেতে হলে প্রচণ্ড গতিতে হিগসের-সমুদ্রকে ধাক্কা দিতে হবে। এমন জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার ছাড়া আর কারও নেই। সেখানে প্রোটনকে আলোর গতির ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শতাংশ গতিতে ত্বরান্বিত করা হয়। আর এভাবে দুদিক থেকে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটানোর মাধ্যমে মৌলিক কণা তৈরি করা হয়।

সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করলেন বিজ্ঞানীরা। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে সংঘর্ষের মাধ্যমে ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি উৎপন্ন হয়, আর সেই শক্তির ধাক্কায় উপ-পারমাণবিক কণিকারা (subatomic particles) দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটতে থাকে যত্রতত্র। সেগুলো আবার ধরা পরে যন্ত্রদানবের ডিটেক্টরগুলোতে। এভাবেই আটলাস আর সিএমএস ডিটেক্টরে ধরা পড়ল মহামান্যবর হিগসের অস্তিত্ব।

হিগসের শক্তি অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে হিসেব করা হয়েছিল অনেক আগেই। বিজ্ঞানীরা জানতেন হিগস-কণা যদি থেকে থাকে তবে সেটার ভর থাকবে ১১৪ থেকে ১৩১ বিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (যেটাকে নতুন এককে গিগা-ভোল্ট বলা হয়) এর মাঝামাঝি জায়গায়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান মিথ্যে হয়নি। প্রোটন নিয়ে গুঁতোগুঁতির ফলাফল শনাক্ত করতে গিয়ে এমন একটা কণা পাওয়া গেল যার শক্তি ১২৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। হিগস-কণার যা যা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা তা এই ফলাফলের সঙ্গে মিলে যায়। আজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, নিচের ছবিতে ১২৫ জিইভি-র কাছাকাছি যে ঢিপি চোখে পড়ছে সেটা হিগস-কণার জন্যই হয়েছে।

হিগসের প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ

এটাই ছিল হিগসের প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ। ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তির নেতৃত্বে এক দল (আটলাস) এবং জো ইনকানডেলার নেতৃত্ব আরেক দল (সিএমএস) পৃথক পৃথকভাবে এই কণার খোঁজ পেয়ে তাদের উপর মহলে সার্ন গবেষণাগারের সার্নের মহাপরিচালক রলফ হয়ারের কাছে রিপোর্ট করেন। পৃথক দুই দলের পৃথক গবেষণা থেকে যখন একই ফলাফল বেরিয়ে এল তখনই রলফ হয়ার বুঝতে পারলেন সত্য সত্যই হিগসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপরেও নিঃসন্দেহ হবার জন্য তারা বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে ফলাফলগুলো পুনঃপরীক্ষা করলেন।

অবশেষে সবাই হলেন নিঃসন্দেহ। শেষমেশ ২০১২ সালের জুলাই মাসের চার তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হাই এনার্জি ফিজিক্সের একটি দ্বিবার্ষিক কনফারেন্সে হিগসের প্রাপ্তির খবর জানানো হয়। জেনেভার সার্ন থেকে সরাসরি রিলে করা হয় তাদের ঘোষণাটি। গবেষণাগারের মহাপরিচালক রলফ হয়ার যখন এই আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেন, তখন উল্লাস আর করতালিতে ফেটে পড়লেন সমবেত শতাধিক বিজ্ঞানী।

হিগসপ্রাপ্তির বৃহৎ ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তি, রলফ হয়ার এবং জো ইনকানডেলা

হিগসপ্রাপ্তির বৃহৎ ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তি, রলফ হয়ার এবং জো ইনকানডেলা

বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিটার হিগস স্বয়ং। ৮৩ বছর বয়স্ক এ বিজ্ঞানী ঘোষণার সময় হয়ে উঠলেন আবেগে অশ্রুসজল। বললেন, ‘‘আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা আমার জীবদ্দশাতেই ঘটবে।’’

তবে হিগস-বোসনকে মিডিয়ায় যথেচ্ছভাবে সব বস্তুকণাদের ‘ভর সৃষ্টির পেছনে মুখ্য কণা’ বা সরাসরি ঈশ্বরকণা হিসেবে তুলে ধরা হলেও, বাস্তবতা হল– মহাবিশ্বের বস্তুকণার তাবৎ ভর কিন্তু হিগস থেকে আসেনি। বরং সত্যি বলতে কি তাবৎ ভরের খুব নগণ্য ছোট্ট একটা অংশই কেবল হিগস থেকে এসেছে।

তারপরেও হিগস-কণার গুরুত্ব যে ম্লান হয়নি। হিগস না থাকলে কণা পদার্থবিদদের সাধের ‘প্রমিত মডেল’-এর বোধহয় সলিল সমাধি ঘটত। কণাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকত না, সবার চেহারাই হত হুবহু অনুরূপ। ফার্মিয়নেরা সব থাকত ভরহীন হয়ে। আমরা কণাদের যে রসায়নের সঙ্গে পরিচিত, সেই রসায়ন বলেই কিছু থাকত না। কণাদের রসায়ন না থাকলে জীবনের রসায়নও থাকত অনুপস্থিত।

সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, হিগস-বোসন হচ্ছে এমন এক মূল্যবান কণা যা কিনা মহাবিশ্বে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে।মিডিয়ায় যে ‘ঈশ্বর কণা’ হিসেবে হিগসকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেটা হয়তো এসব গুরুত্ব উপলব্ধি করেই।

হিগস না থাকলে মহাবিশ্বের প্রকৃতি কেমন হত, প্রাণের উদ্ভবের সম্ভাবনাই বা কতটুকু থাকত তা নিয়ে নানা ধরনের দার্শনিক আলোচনায় জড়ানো যায়; কিন্তু বাস্তবতা হল, মহাবিশ্বে উদ্ভবের পর থেকেই এই কণার একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল। হিগসের অথই সমুদ্রের কথা যে আমরা বলছি, যেটাকে বলা হয় হিগসের ক্ষেত্র বা হিগস-ফিল্ড; বিগ ব্যাং-এর পর হিগস-ক্ষেত্র তৈরি হবার আগ পর্যন্ত কণাদের ভর বলে কিছু ছিল না।

মহা-উত্তপ্ত অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যখন মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল, তারপর সেটা কিছুটা কমে যখন মিলিয়ন বিলিয়ন ডিগ্রিতে (দশের পিঠে পনেরটা শূন্য চাপালে যে তাপমাত্রা পাব সেটা) পৌঁছেছিল, তখন হিগস বেচারাদের এতই ঠাণ্ডা লাগা শুরু করল যে তারা সব ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এক ধরনের করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যাকে জ্যোতির্পদার্থবিদেরা বলেন ‘কসমোলজিক্যাল ফেজ ট্রান্সিশন’।

এর আগ পর্যন্ত মহাবিশ্বে কণারা লাল ঝাণ্ডা তুলে সাম্যবাদের গান গাইত। কোনো কণারই ভর বলে কিছু ছিল না, পদার্থ-প্রতিপদার্থের সংখ্যা ছিল সমান ইত্যাদি। কিন্তু যে মুহূর্তে হিগস বাবাজির ঠাণ্ডা লাগা শুরু হল, অমনি সাম্য-টাম্য সব ভেঙে পড়তে শুরু করল। রাতারাতি কণাদের ভর গজাতে শুরু করল; কারও কম কারও বেশি।

কেউ চিকনা পটকা হালকা হয়ে রইল, আর কেউ-বা হিগস-ক্ষেত্রের সঙ্গে বেশি করে মিথস্ক্রিয়ায় গিয়ে আর রসদ খেয়ে হয়ে উঠল হোঁদল কুতকুত। যেমন ইলেকট্রন বাবাজি কিংবা লেপ্টন গ্রুপের সদস্যরা হালকা-পাতলা থেকে গেলেও আপ-কোয়ার্ক কিংবা W বা Z কণারা হয়ে উঠল গায়েগতরে হাতির মতন (যেমন আপ-কোয়ার্ক কণাটা আয়তনে ইলেকট্রনের সমান হলেও ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে ৩৫০ হাজার গুণ ভারী)।

সাম্যাবস্থা ভেঙে এই যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় যাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেতাবি ভাষায় বিজ্ঞানীরা বলেন ‘সিমেট্রি ব্রেকিং’, বাংলা করলে আমরা বলতে পারি ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’। তবে এই অসাম্য আর বৈষম্য নিয়ে আমরা যতই অসন্তুষ্ট হই না কেন, হিগস-কণার কল্যাণে প্রতিসাম্যের ভাঙন ব্যাপারটা না ঘটলে পরবর্তীতে তৈরি হত না কোনো অণু কিংবা পদার্থ কিংবা সৌরজগত, নীহারিকা, সূর্য আর পৃথিবীর মতো গ্রহ।

এই প্রতিসাম্যের ভাঙন কীভাবে ঘটতে পারে সেটাই ১৯৬৪ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন ছজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী– পিটার হিগস, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বল, রবার্ট ব্রাউট এবং ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্ট– যাদের কথা আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই জেনেছি।

এদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউট মারা গিয়েছেন ২০১১ সালে। নোবেল পুরষ্কার মরণোত্তর হিসেবে দেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই; তাই রবার্ট ব্রাউট মনোনীত হতে পারেননি। বাকি তিনজন– গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বলের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় সবার শেষে।

কাজেই গুরুত্ব বিচারে তারাও ছাকুনির জাল ভেদ করে উপর উঠতে পারেননি। জয়মাল্য গিয়েছে ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্ট এবং পিটার হিগসের গলাতে।

২০১৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন পিটার হিগস এবং ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্ট। পারমাণবিক এবং উপ-পারমাণবিক কণার ভরের উৎস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে 'হিগস-বোসন' কণার ধারণা করেছিলেন, **২০১২** সালে সার্নের পরীক্ষায় তা সফলভাবে প্রমাণিত হয়। এর স্বীকৃতি হিসেবে **২০১৩** সালে নোবেল পেয়েছিলেন এই দুই বিজ্ঞানী।

ফ্রাঁসোয়া অ্যাঙ্গলার্ট জন্মেছিলেন **১৯৩২** সালে, অধ্যাপনা করছেন ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একটি যুগান্তকারী গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার সহকর্মী রবার্ট ব্রাউটের (অধুনা পরলোকগত) সঙ্গে মিলে যা হিগস-কণার কাজ বুঝতে সহায়ক হয়েছিল।

আর **১৯২৯** সালে জন্মগ্রহণকারী পিটার হিগস এমনিতেই পাদপ্রদীপের আলোতে সবসময়ই ছিলেন, বিখ্যাত কণাটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত থাকায়। তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার এমিরেটাস অধ্যাপক হিসেবে এখনও কাজ করছেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নোবেল কমিটির বলেছেন "একটি প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক আবিস্কারের জন্য, যে প্রক্রিয়া উপ-পারমাণবিক কণাদের ভরের উদ্ভব বুঝতে সহায়তা করে এবং যেটি সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের আটলাস এবং সিএমস-এর পরীক্ষায় নিশ্চিত করা গেছে।"

সাতে পাঁচে থাকি

-সুমন

যখন বোনটা আমার জ্যান্ত পোড়ে
সাজানো চিতায় তড়পে মরে,
তখন বলুন কিকরে দিই ফাঁকি?
হ্যাঁ দাদা আমি সাতে পাঁচে থাকি।

যখন রাতে পুলিশ ঢোকে বুক চিতিয়ে
হাতে বন্দুক ছাদে ওঠে হনহনিয়ে
ভাইকে আমার ফেলে রেখে লাশ বানিয়ে
শাসিয়ে যায় বুড়ো বাপকে ভয় দেখিয়ে
তখন বলুন কিকরে দিই ফাঁকি?
হ্যাঁ দাদা আমি সাতে পাঁচে থাকি।

যখন বাচ্চা সমেত বাড়িগুলো জবলতে থাকে
পুলিশ গুলো খানিক দূরে বসে দেখে
ওরা আমার মাকে কুপোয় কাটারি হাতে
কেমন করে বলুন আমি মজা দেখি
হ্যাঁ দাদা আমি সাতে পাঁচে থাকি।

সবাই যখন চুপটি করে বোবা সাজে
টেবিল তলায় আলতো করে মাথা গোঁজে
তখন খালি শিরদাঁড়াটার জন্য
নামতেই হয় রাস্তায় হতেই হয় বন্য
তাইতো দাদা থাকতেই হয় সাতে পাঁচে
সর্বক্ষণ রাজরোষের খাঁড়ার নীচে
লাঠি আছে, গুলি আছে, আছে অনেক ভয়
কি করব বলুন, আয়নায় চোখে চোখ যে রাখতে হয়।

‘চেতনার অন্বেষণে’ পত্রিকার জন্য লেখা পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। যুক্তির পথে আমরা।